Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত তাসনিম রুকাইয়া

রোলঃ 216020831227

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত তাসনিম রুকাইয়া

রোলঃ 216020831227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ------, আইডিঃ ------- বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rukaiya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইসরাত তাসনিম রুকাইয়া

আইডিঃ 216020831227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সূচনা:

"একজন মুসলমানের জন্য ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হচ্ছে নামায”

নামাজ কালেমা শাহাদতের স্বীকৃতির পরই ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। নামাজ ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ।

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার বিনয় ও অনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার চরম আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দার কাছে সালাতের হিসাব চাইবেন।

সালাত নিত্যপালনীয় একটি ফরয ইবাদাত হলেও আদর্শ জীবন গঠনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। আদর্শ জীবন বিনির্মাণে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি সালাত আদায়ের মাধমে অর্জন করা যায়। পাপাচার, অন্যায় ও অশ্লীলতামুক্ত আদর্শ জীবন গঠনে সালাত সহায়তা করে। সালাত সকল প্রকার পাপাচার ও খারাপ কাজ পরিহার করে সৎ পথে পরিচালিত করে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- “নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। (সুরা আল- 'আনকাবুত;আয়াত: ৪৫)

সালাত আমাদের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় সমাজের উচু-নিচু, ধনী- নির্ধন এবং সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় । সালাত আমাদের সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়। সালাতে রুকু সিজদাহ যথানিয়মে করতে হয়। এতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার শিক্ষা পাওয়া যায়। আর

নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সকল কাজ সঠিক সময়ে করারও শিক্ষা পাওয়া যায়। নিয়মিত সালাত আদায়কারী সাধারণত কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না। অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে একাগ্র চিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। একাগ্রতাবিহীন সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সালাত আদায়ের সময় মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয় মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিতবিনয় ও একাগ্রতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহর যে সকল বান্দা এভাবে বিনয়-নম্রতা ও বিনম্র- একাগ্রতা নিয়ে সালাত আদায় করে তাদের সফলতা অবশ্যাম্ভাবী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন _ “অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন,যারা নিজেদের সালাতে বিনয় ও নম্র

(সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ১-২)

নামাজের পরিচিতি:

নামাজ শব্দটি ফারসি শব্দ- এর আরবি প্রতিশব্দ হলো “ সালাত “। কোরআন হাদিসে সালাত শব্দটিই ব্যবহার হয়েছে।। সালাত অর্থ হলো ক্ষমা চাওয়া , দোয়া করা, আল্লাহর পবিত্রতা ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা।

(সালাত) আরবি শব্দ, বহুবচনে صلاةُ ت (সালাওয়াত "সালাত'"-এর আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ: দোয়া, রহমত, নত হওয়া, অনুসরণ করা, উপাসনা, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি বুঝায়। ইসলামী পরিভাষায় শারিয়াহ নির্ধারিত তথা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আমলকৃত কতিপয় আহকাম-আরকান সহকারে বিশেষ বিশেষ ওয়াক্ত বা সময়কালে আদায়কৃত বিশেষ ইবাদাত-কে সালাত বা নামায বলে।

নামাজের ওয়াক্ত:

مهيلع ًهتقو اتقوم اتوقوم اباتك ًنينمؤملا ىلع ًتَناك ً َةلاصلا ًنإ (ًهلوقو (ْ
আল্লাহ্‌তা'আলার বাণীঃ “নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা মুমিনদের উপর ফার্য (ফরয)।” (সুরাহ আন-নিসা ৪/১০৩)
১ ফযর, ২ যোহর, ৩ আসর, ৪ মাগরিব, ৫ ইশা
প্রতিদিন একজন মুসলিমকে ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হয়।

প্রথম ওয়াক্ত হল "ফজর নামাজ" সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল।
এরপর "যুহর ওয়াক্ত" বেলা দ্বিপ্রহর হতে "আসর ওয়াক্ত"'-এর আগ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি।
তৃতীয় ওয়াক্ত "আসর ওয়াক্ত" যা সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত পড়া যায়।
চতুর্থ ওয়াক্ত হচ্ছে "মাগরিব ওয়াক্ত" যা সূর্যান্তের ঠিক পর পরই আরম্ভ হয় এবং এর ব্যাপ্তিকাল প্রায় ৩০-৪৫ মিনিট।
"মাগরিব ওয়াক্ত" এর প্রায় ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পর আরম্ভ হয় "ইশা ওয়াক্ত" এবং এর ব্যাপ্তি প্রায় "ফজর ওয়াক্ত"-এর আগ পর্যন্ত।
উপর্যুক্ত ৫ টি ফরজ নামাজ ছাড়াও ইশা'র নামাজের পরে বিতর নামাজ আদায় করা ওয়াজিব ।

নামাজের প্রকারভেদ:

নামাজে মহান মাবুদকে স্মরণ করা হয়, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। প্রকৃতঅর্থে নামাজের কোনো প্রকারভেদ নেই; নামাজ নামাজই। তবে গুরুত্ব বিবেচনায় শরিয়ত নামাজকে একাধিক ভাগে ভাগ করেছে। যেমন- ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাজ।
নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:
ফরজ: ফরজ নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে । না পড়লে গুনাহ হবে। এ নামাজ আবার দুধরনের। যথা- ১. ফরজে আইন । যা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ । ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত নামাজগুলো হলো- ফজরের নামাজ; জোহরের নামাজ; আসরের নামাজ; মাগরিবের নামাজ; এশার নামাজ ও জুমার নামাজ।

২.ফরজে কিফায়া। যা আদায় করা প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে ফরজ নয়। যেমন- জানাজার নামাজ।

ওয়াজিব: যে নামাজের গুরুত্ব ফরজের পরই। যেমন- দুই ঈদের নামাজ ও বিতর নামাজ হচ্ছে ওয়াজিব। কেউ ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিত না পড়লে গুনাহ হবে।

সুন্নাত: ফরজ নামাজের পাশাপাশি সুন্নাত নামাজের গুরুত্বও কম নয়। কারণ সঠিক পদ্ধতিতে গুরুত্ব সহকারে সুন্নাত নামাজ আদায় করার মাধ্যমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম আদর্শ অনুসরণ ও তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুন্নাত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়, কিয়ামতের দিন কারো ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহতায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ
করবেন।

এ নামাজ আবার দুধরনের । যথা- ১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যা রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন। যেমন- ফজরের ফরজের পূর্বে ২ রাকাত; জোহরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত; মাগরিবের ফরজের পরে ২ রাকাত; এশার ফরজের পরে ২ রাকাত এবং তারাবির নামাজ। ২. সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। যা রাসুল (স.) নিয়মিত আদায় করতেন না, কখনো বিশেষ প্রয়োজনে ছেড়েও দিতেন। এ নামাজ আদায় করলে অশেষ পুণ্য লাভ করা যায়, কিন্তু কোনো কারণে আদায় করতে না পারলে গুনাহ হবে না। যেমন- আসরের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত এবং এশারের ফরজের পূর্বে ৪ রাকাত।

নফল: নফল নামাজ পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। অনেকের মতে, হাশরের মাঠে যদি ফরজ নামাজ প্রয়োজনের থেকে কম থাকে, তাহলে মহান আল্লাহ ফরজের পরে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি থেকে নিয়ে সেই মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে এটা খুব একটা জরুরি মনে না হলেও প্রকৃতঅর্থে অত্যন্ত জরুরি। এ নফল নামাজই রোজ হাশরে মানুষের জন্য বেহেশত-দোযখের সিদ্ধান্তকারী হয়ে যেতে পারে। তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত, আওয়াবিন- এগুলো হলো গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ।

নামাযের ফজর ওয়াজিব ও সুন্নাহ সমূহ:

>> সালাতের বাইরের ৭টি ফরজ।

১. শরীর পাক
২. কাপড় পাক
৩. নামাযের স্থান পাক
৪. সতর আবৃত করা
৫. কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো
৬. নিয়ত করা এবং
৭. ওয়াক্ত মত নামায পড়া।

এর কোনো একটি ফরয ইচ্ছায় বাদ দিলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

>> সালাতের ভেতরের ১০টি ফরজ।
বিশুদ্ধ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞ ফকীহগণের মতে, সালাতের ভেতরের ১০টি ফরজ বা রুকন।

১. কেয়াম বা দাড়ানো।
২. তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করা।
৩. সূরা ফাতিহা পড়া।
৪. রুকু করা।
৫. সেজদা করা।
৬. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক।
৭. শেষ বৈঠক ও তাশাহুদ(আত্তাহিয়াতু) পড়া।
৮. ধীরস্থিরভাবে(রুকন গুলো) আদায় করা।

৯. ধারাবাহিকতা(রুকন আদায়ে) রক্ষা করা।
১০. সালাম ফিরানো।

এর কোনো একটি ফরয ইচ্ছায় বা ভুলে বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

>> সালাতের ওয়াজিবসমূহ ৭টি।

১. সকল তাকবীর।
২. সূরা মিলানো।
৩. সামিয়াল্লাহু লিমান হামীদা (ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী তাসবীহটি পড়বে)।
৪. রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলা (রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারী তাসবীহটি পড়বে)।
৫. সালাতের প্রথম বৈঠক।
৬. প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়া।
৭. শেষ বৈঠকে দরুদ পড়া (এক দল ফিকহবিদের মতে, এটি ফরজ)।

এর কোনো একটি ফরয ইচ্ছায় বাদ পড়লে সালাত বাতিল হয়ে যাবে।ভুলে বাদ পড়লে সাহু সেজদা দিতে হবে।

[[*উপরে উল্লেখিত ফরজ, ওয়াজিব এর দলিল পাওয়া যাবে: পবিত্র কুরআন, বুখারী, আবূ দাউদ, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ।*]]
[[লেখা সংগ্রহ বই: '*যেভাবে নামায পড়তেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পৃষ্ঠা ২৯-৩০ থেকে]]*

>> সালাতের সুন্নাতসমূহ।

সালাতের সুন্নাত অনেক সংখ্যক রয়েছে তন্মধ্যে নিম্নে ১০ টি দেওয়া হলো।

১. দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠানো।(বুখারী)।
২. বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বুকের উপর রাখা।(আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমা)।
নাভীর নিচের চেয়ে বুকের উপর হাত বাধার হাদীস বেশি সহিহ।
৩. রাফউল ইয়াদাঈন করা অর্থাৎ রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে মাথা উঠানো এবং চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠার সময় দু'হাত কাধ বা কান বরাবর

উঠানো। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ:) বলেছেন রাসূল (সা:) আজীবন রাফউল ইয়াদাঈন করেছেন।

(যাদুল মা'আদ)।

৪. সিজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখা।(বায়হাকী)।

৫. ছানা পড়া।(বুখারী)।

৬. "আউযু বিল্লাহ পূর্ণ পড়া।(আবূ দাউদ)।

৭. "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"পড়া।(মুসনাদে আহমদ)।

৮. সুরা ফাতেহার শেষে আমীন বলা।(বুখারী)।

৯. পিঠকে সমতল ভাবে বিছিয়ে দেওয়া।(আবূ দাউদ)।

১০. দুই সিজদার মাঝে মাগফিরাত চাওয়া অর্থাৎ 'রাব্বিগ ফিরলী' পড়া।(আবূ দাউদ)।

১১. তাশাহুদে চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া।(বুখারী)। কিছু আলেম এটাকে ওয়াজিব বলেছেন।

সুন্নাত ছুটে গেলে সালাত বাতিল হয় না, তবে সাওয়াব কমে যায়।

নামাজের নিষিদ্ধ সময়:

ইসলাম সময় ব্যবস্থাপনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলামে অনেক ইবাদাতও আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা সরাসরি সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলো নির্ধারিতসময়সীমার মধ্যেই পালন করতে হয়। ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি এবংঅপরিহার্য ইবাদাত-সালাত আদায়ের জন্যও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। মহানবি (সা.) এর হাদিসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ আদায়ের উত্তম সময় সম্পর্কে যেমন নির্দেশনা রয়েছে তেমনি নামাজের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে।

নামাজের নিষিদ্ধ সময় তিনটি। আর তা হলো -

১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়;

২. ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়; এবং

৩. সূর্যাস্তের সময়।

এ সময়গুলোতে সাধারণত নামাজ আদায় করা নিষেধ । তবে কোনো কারণে কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ দিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারে তবে তা আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। এ নিষিদ্ধ সময় প্রসঙ্গে সাহাবি উকবা ইবনে আমের জুহানী

(রা.) বলেন, "তিনটি সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়;যতক্ষণ না তাপুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে শুরু করে তাপশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তা হলুদাভ হওয়াথেকে শুরু করে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অস্ত যায়।' (মুসলিম)

নামাজ ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত:

মুসলিম হওয়া

সাবালক হওয়া

সুস্থ মস্তিষ্কের (মানুষ) হওয়া।

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

নামাজ পড়া মানে মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করা। দুনিয়ার রাজা-বাদশার সামনে কথা বললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়ে থাকে! সে তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে কেমন হওয়া চাই আমাদের অবস্থা! অবশ্যই ভয়-ভীতি ও মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাজেদাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করো!" (বুখারি : ৪১৩)।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করততখন তিনি তাকে সর্বপ্রথম নামাযের অঙ্গীকার করাতেন।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বের নবী-রাসূলগণও তাওহীদের পরেইনামাযের আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-"তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছিলএকনিষ্ঠভাবে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে।(সূরা বায়্যিনাহ ৫)একমাত্র নামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজেরমাধ্যমেই বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতমসৌন্দর্য হচ্ছে কোনো দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে বান্দা নামাজের মাধ্যমেসাক্ষাত করতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে।মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে নিজেকে তার প্রভুর কাছে সমর্পণ করা। আর সালাতহচ্ছে নিজেকে আল্লাহর কাছে শারীরিক ও মানসিকভাবে সপে দেওয়ার সবচেয়ে সুন্দরমাধ্যম।পবিত্র কোরান ও হাদিস গ্রন্থে বহু জায়গায় সালাত কায়েম করার তাগিদ ও

গুরুত্বদেওয়া হয়েছে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করামুমিনদের উপর ফরয।(সুরাহ আন-নিসা, ১০৩)আল্লাহ সালাতকে ফরয করে দিয়েছেন বিধায় কোনো অবস্থাতেই বিনা ওযরে (ইচ্ছাকরে) সালাত ছাড়া যাবে না। (ইসলামিক পরিভাষায় "করয' মানে হচ্ছে অবশ্যকরণীয়)।আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আরো বলেন, "তোমরা আল্লাহ অভিমুখী হও এবং তাকে ভয়কর আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর, এবং মুশরিকদের অন্তভূক্ত হয়ো না। "(সুরাহ আর-রুম, ৩১)সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার প্রভুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, তাই সালাত আল্লাহরআনুগত্য লাভের জন্য একটি সুন্দর ইবাদাত। একাগ্র মনে সালাত আদায়কারী নিজেরও সমাজের কল্যান ব্যতিত কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। এছাড়া সালাতঅশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।নামাজ প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ (বাধ্যতামূলক)। নামাজ ছাড়া ইহকালীন ওপরকালীন মুক্তি অসম্ভব। নামাজ পাপাচার থেকে মুক্ত রাখে। স্বচ্ছ, সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময়জীবন লাভ হয়। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরতরাখে।" (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)একজন কাফের ও ঈমানদারের সর্বপ্রথম পার্থক্য হলো নামাজ । নামাজের মাধ্যমেমানুষ নিজেকে আল্লাহর প্রতি অনুগত হিসেবে প্রকাশ করে । নবি (স.) বলেছেন-" নামাজের মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ পায় ।*আর সালাতে অলসতাকারীদের মধ্যে শ্রেণিভেদ রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন যেসে কখনও সালাত আদায় করে না, এটি হলো কুফুরী। তাদের মধ্যে কেউ সালাতেরব্যাপারে অলসতাকারী।নামাযের অগণিত ফযীলতের মধ্যে একটি হচ্ছে নামায মানুষকে অন্যায় ও গুনাহ থেকেরক্ষা করে। ইরশাদ হয়েছে-নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে ।"(সুরা আনকাবৃত : ৪৫)এখানে প্রশ্ন হয়ে থাকে, নামায তো আমাদের গুনাহ থেকে হেফাযত করে না? এরউত্তর উক্ত আয়াতের মধ্যেই রয়েছে। বলা হয়েছে যে, 'অবশ্যই আল্লাহর যিকর (স্মরণ)সবচেয়ে বড়'। এ অংশে আল্লাহ তাআলা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রকৃত রহস্য বলেদিয়েছেন। অর্থাৎ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরতকারী হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ। যারনামাযে আল্লাহর স্মরণ যত বেশি হবে নামায তাকে তত বেশি গুনাহ থেকে বাঁচিয়েরাখবে। আমাদের নামায সম্পর্কে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের নামাযের প্রকৃতঅবস্থা নিজেরাই অনুধাবন করতে সক্ষম হব। আমাদের তো গাফলতের কারণে এমনইঅবস্থা যে, অনেক সময় নামাযের শেষে মনেও করতে পারি না যে, কোন কোন সূরাপড়েছি। আর মোটামুটি খেয়াল করে নামায পড়লেও আমরা কি খেয়াল করি যে, আমাররবের সাথে আমার কী কী কথোপকথন হল? এগুলো চিন্তা করলেই আমরা বুঝে যাবএই ফযীলত লাভের আমরা কতটুকু হকদার ।নামাযের ফযীলত সংক্রান্ত বহু হাদীস বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীসউল্লেখ করা হল:হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেবলতে শুনেছি, "তোমরা কি বলতে পার যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটিনদী থাকে আর সে এ নদীতে পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কি কোনোময়লা থাকবে? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, তার শরীরে কোনো

ময়লা থাকবে না।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ঠিক এমনই।আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা গুনাহসমূহ ধুয়ে মুছে ছাফ করে দেন।' (সহীহ বুখারী ১/৭৬)হযরত উছমান রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেশুনেছি, যখন নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয় তখন যে মুসলিম সুন্দরভাবে অযু করেখুশু-খুযূর সাথে উত্তমরূপে নামায আদায় করে, তার কবীরা গুনাহ ছাড়া পূর্বের সকলগুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর এ রকম সর্বদাই চলতে থাকে। (সহীহ মুসলিম ১/১২১)অর্থাৎ প্রতি নামাযেই এভাবে গুনাহ মাফ হতে থাকে।হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদকরেছেন যে, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ মধ্যবর্তী সময়েরজন্য গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ সংঘটিত না হয়।" (সহীহ মুসলিম১/১২২)হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালেএকবার বের হলেন। এঁ সময় গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছ থেকে দুটিডাল নিয়ে সেগুলো নাড়া দিয়ে পাতা ফেলতে থাকেন এবং বললেন, আবু যর! আমিবললাম, লাববাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান যখনআল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে তখন তার গুনাহগুলো এভাবে ঝরে যায়যেমন এই গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে। (মুসনাদে আহমদ ৫/১৭৯)নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إ لوأ ام بساحي هب دبعلا موي ةمايقلا نم هلمع هتلاص نإف تحلص دقف حلفأ حجنأو ن
ف دقف باح رسخو

কেয়ামতের দিন বান্দার কাছে সর্বপ্রথম নামাজের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নামাজেরহিসেব নেওয়া হবে। কেয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে না বান্দা দুনিয়াতে তোমারকয়টা বাড়ি ছিল।কয়টা গাড়ি ছিল? কতখানি জমি ছিল। কোন এলাকার নেতা ছিলা?কোন আসনের এমই ছিলা? এসব বিষয়ে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন না।আল্লাহ তায়ালাআপনার আমার কাছে সর্বপ্রথম যে প্রশ্নটা রাখবেন তা হচ্ছে বান্দা নিয়মিত নামাজপড়েছ কিনা? সঠিকভাবে নামাজ পড়েছ কিনা? হিসেব দাও । যদি সঠিকভাবে নামাজেরহিসাব দিতে পারে তাহলে সে সফলকাম হয়ে যাবে। আর যদি হিসেবে গরমিল হয়তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। সে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তিরমিজি, সহীহ হাদিস

م ظفاح اهيلع تناك هل ارون اناهربو ةاجنو نم رانلا موي ةمايقلا نمو مل ظفاحي اهيلع م
ت هل ارون ةاجنو اناهربو ناكو موي ةمايقلا عم نوراق نوعرفو ناماهو يباو نبا ف

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাধিঃ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তিনামাজের হেফাজত করবে (নামাজ) তার জন্য নূর, দলীল ও নাজাতের উপায় হবে।আর যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করবে না তার কোনো নূর, দলীল ও নাজাতেরব্যবস্থা হবে না। সে কেয়ামতের দিন কাড়ুন, ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনেখালফের সাথে থাকবে । _মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ৫৭৮

ق لوسر الله ىلص الله هيلع ،ملسو لاق الله ىلاعت ينإ تضرف يلع كتمأ ًسمخ تا
و يدنع ادهع هنأ نم ءاج ظفاحي ...نبا ةجام

নামাজ ফরজ করার পর আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন। : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি তোমার উম্মতের উপরপাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দিলাম । আর আমি ওয়াদা দিলাম, যে ব্যক্তি এই পাঁচওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত ওয়াক্তে আদায় করবে আমি আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতেপ্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের হিফাজত করবে না তার জন্যে আমার কোনোওয়াদা নেই। (ইবনে মাজাহ ৪৩০)কিয়ামতের দিন লক্ষকোটি বনী আদম যখন বিচারের মাঠে উপস্থিত হবে। আল্লাহতায়ালা তখন জিজ্ঞেস করবেন, দুনিয়ার বুকে কারা আমাকে সিজদা করেছ? হাতউঠাও, সেদিন সবাই হাত উঠিয়ে বলবে আমরা সিজদা করেছি, নামাজি-বেনামাজি,কাফের-মুশরিক সবাই হাত উঠাবে। কেউ বাদ থাকবেনা । তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেনঠিক আছে তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক, এই মুহুর্তে সবাই আমাকে সিজদা করো। তখনসবাই আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় চলে যাবে। সবাই যখন সিজদায় চলে যাবেএকদল মানুষ তখন দাঁড়িয়ে থাকবে । সিজদা করতে পারবে না। শত চেষ্টা করেওসিজদা করতে পারবে না। তাদের মেরুদন্ডের হাড্ডিটা কাঠের মতো শক্ত হয়ে যাবে।তারা কারা জানেন? বেনামাজীর দল। কেয়ামতের দিন এঁ বেনামজীর দল ধরা খেয়েযাব। লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতে পারবে না। চেহারা লাল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালাতাদের বলেন, ৬৮: আল-কলম,আয়াত: ৪২,
نوعيطتسي ًلاف ًدوجسلا ىلا ًنوعدي ًو ًقاس ًنع ًفشكي ًموي ْ ْ

(স্মরণ করো) যেদিন (যাবতীয়) রহস্য উদঘাটন হয়ে যাবে, তখন তাদের সিজদাবনত হওয়ার আহ্বান জানানো হবে, এসব হতভাগা ব্যক্তি (কিন্তু সেদিন সিজদা করতে) সক্ষম হবে না।

(সূরা কলম আয়াত: ৪২)
ঐসব লোককে নামাজের জন্য (দৈনিকপাঁচবার আমার ঘর মসজিদে থেকে ডাকা হত) কিন্তু তারা সুস্থ সবল থাকা সত্তেওনামাজে আসত না।
(সুরা কলম ৪৩)

এ বেনামাজি -দেরকে যখন জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, জাহান্নামের ফেরেশতারাজিজ্ঞেস করবে? ওরে হতভাগার দল তোরা জাহান্নামে কেন আসলি, জাহান্নামে তো কোন ভালো মানুষ আসেনা।
م مككلس يف رقس

তোদের অপরাধ কি? তারা বলবে

ْ ق ًمل ًكَن ًنم نيلصملا

আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা দুনিয়াতে মুসল্লী ছিলাম না। আমরা হলাম বেনামাজিরদল। এই নামাজ না পড়ার কারণে আজ আমাদের এই দুরবস্থা ।

(সূরা মুদ্দাসিসর আয়াত ৩৩-৪৪)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ا ول نأ ارهن بابب مكدحا لستغي هنم لك موي سمخ تآرم له بقبي نم هنرد ء
ق لا بقبي نم هنرد لاق كلاذف لثم تاولصلا سمخلا اوحمي الله نهب ايا

তোমাদের কারো বাড়ির দরজার সামনেই যদি একটি নদী থাকে আর সে এ নদীতেপ্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে?সবাই বল্ল না, তার শরীরে কোন প্রলার ময়লা থকবে না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এটিই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের দৃষ্টান্ত | এর দ্বারা আল্লাহতা"আলা সকল পাপ মুছে নিঃশেষ করে দেন। (বুখারী ও মুসলিম)শুধু তাই নয়, যদি কোনো ব্যক্তি নামাজের জন্যে অযু করে তাহলে সে অযুর বিনিময়েআল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোনাহ ক্ষমা করতে থাকেন।

إ أضوت دبعلا ملسملا وا نمؤملا لسغف ههجو جرخ ت نم ههجو لك ًةئيطَخ رظن اهيلإ هنيعب م ءاملا وأ عم رخآ ةرطق ءاملا وأ وحن اذه اذإو ًلسَغ ًهيدي ًتجرَخ ًنم ًهيدي ًلك ًةئيطَخ

ْ ب ًهادي ًعم ًءاملا ًوأ ًعم ًرخآ ًرطق ًءاملا ىتح ًجرخي ايقَن ًنم بونذلا "

যখন কোন মুমিন অথবা মুসলিম বান্দা অযু করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে, তারমুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে পানির সাথে অথবা পানির শেষবিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়।যখন সে তার দুহাত ধৌত করে,তখন তার দুহাত দ্বারা যত গোনাহ হয়েছে তা ওযুরপানির সাথে অথবা শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গোনাহ থেকেপবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম ও তিরমিজি)।

و يبأ رذ نأ يبنلا ﷺ جرخ نمز ءاتشلا قرولاو تفاهتي ذخأف نيصغب نم ةرجش لاق
لعجف ... ًهاور د

আবু যর রাযি: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক শীতের মৌসুমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, আর তখন গাছের পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি একটিগাছের দুটি ডাল ধরে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের পাতা ঝরতে লাগল । হযরত আবু যররাযি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন, হেআবু যার! উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন,নিশ্চয়ই আল্লাহর কোন মুসলিম বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিধানের জন্য খালিস মনেসলাতে আদায় করে,তার জীবন থেকে তার গুনাহসমূহ এভাবে ঝরে পড়তে থাকেযেভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে। (আহমদ, সহীহ)।

নামাজে খুশু খুযু:

খুশু-খুযু কি? খুশড আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ- বিনয় ও নম্রতা । পরিভাষায় "খুশু"শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। ১. বিনয় ও নম্রতা; ২. শান্তি ও স্থিরতা। অন্তরে খুশড বলতেএই উভয় অর্থকেই বোঝায় । সালাতের মধ্যে খুশড থেকে উদ্দেশ্য অন্তরের ওই অবস্থায়,যা অন্যান্য অঙগ-প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রসারিত হয় এবং তাতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েওশান্ত ও বিনয়ীভাব প্রকাশ পায়। সালাতে আল্লাহর ভালোবাসা, ভয়-ভীতি ও সাওয়াবেরপ্রত্যাশায় এর আদ্যোপান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে খুশুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খুশু হচ্ছেসালাতের প্রাণ ও সালাতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য। খুশুবিহীন সালাতের দৃষ্টান্ত মৃত লাশেরমতো, যার কোনো প্রাণ নেই। সত্যিকারার্থে যারা খুশু-খুজুর সাথে সালাত আদায়করে, কুরআন-সুন্নাহতে তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট ফজিলত বর্ণিত রয়েছে।খুশু' এর প্রায় সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে খুযু। তবে উভয় শব্দের মধ্যে সামান্য পার্থক্যবিদ্যমান। তা হচ্ছে, খুশড মূলত কণ্ঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা এবং তা এরপ বিনয় প্রকাশার্থেব্যবহার হরা হয়, যা কৃত্রিম নয়; বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতি স্বরূপ হবে।আর 'খুজু শব্দটি দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় এবং নম্রতাকে বোঝায়।মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন- "এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।" (সূরা আল-বাকারা-২৩৮) এখানে আল্লাহ্র জন্য দাঁড়ানো বলতে সালাতে দাঁড়াতে বলা হয়েছে,বিনীত হওয়া বলতে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতেবলা হয়েছে। কেননা সালাত মানেই আল্লাহর সাথে কথা বলা আর আমরা যার সাথেকথা বলি নিশ্চয়ই তার দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়েই কথা বলি, যদি এমন হয় যে যারসাথে কথা বলছি তাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি না তাহলে নিশ্চয়ই তিনিও আমাদের গুরুত্বদেবেন না এটিই স্বাভাবিক।খুশড খুযুর ফজিলত :কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- "মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।যারা নিজেদের নামাজে বিনয় নম্র।' (সূরা মুমিনুন : ১-২) হাফেজ ইবনে কাছির রহ:দ্বিতীয় আয়াতের তাফসিরে লিখেন, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং স্থিরতারসাথে নামাজ আদায় করে, তারাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য । আর খখুশু" অর্থ শান্তময়িতা,স্থিরতা ও নম্রতা । যা আল্লাহর ভয় ও তাঁর মুরাকাবার কারণে অন্তর ও অন্যান্য অঙগ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রকাশ পায়, এর নামই হচ্ছে খুশড। (তাফসিরে ইবনে কাছির, খণ্ড-৩,পৃষ্ঠা-৩১৭

আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায়ের ফজিলত:

আল্লাহ সুবহানাতা'আলা নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে বলেন- “নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত ফরয করা হয়েছে”
(নিসা ১০৩)।

ع ًما ً ًةورف ًتلاق ًلئس ًلوسر ًالله ًنأ ًلامعلأا ًلضفأ ًلاق ًةلاصلا ًىف ًلوأ
اهتقو .

উম্মু ফারওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করাহয়েছিল, আমল সমূহের মধ্যে কোন্আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন,আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা [1]

و ًىدنع ادهع ًهنأ ًنم ًءاج ًظفاحي ًنهيلع ًنهتقول ًهتلَخدأ ًةنجلا ًنمو ًمل ًظفاحي
نهً

و ًىدنع ادهع ًهنأ ًنم ًءاج ًظفاحي ًنهيلع ًنهتقول ًهتلَخدأ ًةنجلا ًنمو ًمل ًظفاحي
نهً

ف ًدهع ًهل ىدنع ْ

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমিআপনার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছি, আর একটি অঙ্গীকার করেছিযে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি সেগুলোকে ওয়াক্ত অনুযায়ী যথাযথভাবে আদায় করে উপস্থিতহবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে না, তারজন্য আমার কোন অঙ্গীকার নেই।[2] উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীস উপমহাদেশীয় ছাপা আবুদাউদে নেই।

ع ًريرج ًنب ًدبع ًالله ًلاق انك ًدنع ًيبنلا ًرظَنف ىلإ ًرمقلا ًةليل ىنعي ًردبلا
لاقف ًمكنإ ًنورتس ًمكبر امك ًنورت اذه ًرمقلا ًلا ًنوماضت ًىف ًهتيؤر ًنإف ًً
متعطتسا ًنأ ًلا اوبلغت ىلع ًةلاص ًًَلبق ًعولط ًسمشلا ًلبقو اهبورغ اولعفاف ًمث ًً
أرق ًحبسو ًدمحب ًكبر ً بق ًل ًعولط ًسمشلا ًلبقو بورغلا ً

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূল ৬ এর নিকটউপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরাতোমাদের রবকে অচিরেই দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ।তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং সূর্যোদয়ের পূর্বেরনামাজ ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামাজের প্রতি যত্্শীল হও। অতঃপর তিনি এইআয়াত পড়েন, “সুতরাং তোমরা প্রতিপালকের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর সূর্যোদয়েরপূর্বে ও সূর্য ডুবার পরে'।

ع ًدبع ًالله ًنب ًةلاضف ًنع ًهيبأ ًلاق ًىنملع ًلوسر ًالله ًناكف اميف ًىنملع
ظفاحو ىً

ا ًسمَخلا ًلاق ًتلق ًنإ ًهذه ًتاعاس ًىل اهيف ًلاَغشأ ًىنرمف ًرمأب ًعماج اذإ اَنأ
هتلعف ًً

أ ًىنع ًلاقف ًظفاح ىلع ًنيرصعلا امو ًنارصعلا ًلاقف ًةل ًتلقف امو ًنم اَنتَغل ًتَناك
ق ًعولط ًسمشلا ًةلاصو ًلبق اهبورغ .

আব্দুল্লাহ ইবনু ফাযালা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহএকদা আমাকে কিছু বিষয় শিক্ষা দান করেন। তার মধ্যে রয়েছে, তুমি পাঁচ ওয়াক্তনামাজের ব্যাপারে যত্্রবান হও। আমি বললাম, এই সময়গুলো আমার জন্য খুবব্যস্ততার। সুতরাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাকে নির্দেশ দিন। যখন আমি তা পালনকরব, তখন যেন আমার জন্য তা যথেষ্ট হয়। তিনি বললেন, তুমি দুই আসরকেযথাযথভাবে আদায় কর। এই ভাষা আমার জানা ছিল না। আমি বললাম, দুই আসরকী? তিনি বললেন, সূর্য উঠার পূর্বের নামাজ এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামাজ।

কুরআনে নামাযের গুরুত্ব :

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম। দ্বীন ও শরীয়তের মূল উৎস। আসমানী শিক্ষা ও হেদায়েতের প্রধান স্তম্ভ। আমাদের সবার কর্তব্য, প্রতিদিন অল্প অল্প করে হলে ও কুরআন তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা ও হেদায়েত দ্বারা জীবনকে আলোকিত করা ।নামাজ আদায় প্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এমন এক ইবাদত যা বালেগ-বালেগা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক । এ নামাজ আদায়ে আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণের পাশাপাশি দুনিয়াবী কল্যাণও আছে।(১) “নামাধীরা পাবে জান্নাতে সম্মানজনক আসন যারা নিজেদের সালাত হেফাযত করে, (পরকালে) তারা (অতীব) মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে অবস্থান করবে।” (সুরা ৭০;মাআরিজ ৩৪৩৫)।(২) সালাতের কারণে অপরাধ থেকে আল্লাহ নিজেই তাদেরকে হেফাযতে রাখেন।“নিঃসন্দেহে সালাত (মানুষকে) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে ।” (সূরা ২৯;আনকাবুত ৪৫)(৩) সালাত আদায় কারীরা সফলতা লাভ করে ফেলেছে, “এসব মুমিন বান্দারা নিশ্চিত সফলতা লাভ করে ফেলেছে, যারা তাদের সালাতে (খুশু-খুযু ও) বিনয়াবনত থাকে”(সূরা ২৩; মুমিনূন ১-২)। এখানের আয়াতে “ফালাহ' শব্দের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ বুঝানো হয়েছে।(৪) সালাত হলো এক উত্তম যিকির।আর এর মধ্যে রয়েছে আত্মার প্রশান্তি। “যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং যাদের অন্তকরণ আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, একমাত্র আল্লাহর যিকিরই (মানুষের) অন্তর সমূহকে প্রশান্ত করে।” (সূরা১৩; রাশদ ২৮)(৫) ইহ ও পরকালের কাজকর্মের সহায়ক হলো সালাত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা সবরও সালাতের মাধ্যমে সহায়তা চাইতে বলেছেন, “(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা!) তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) কাছে সাহায্য চাও।” (সূরা ২; বাকারা ৪৫)।এ জন্য যখন কোন সমস্যা আসতো বা বড় বড় কাজ আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। আর এরই মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন।(৬) এ আমলের মধ্যে রুযী-রোজগারেরও প্রশস্ততা রয়েছে, যে প্রাপ্তি একেবারেই নগদ। “তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং তুমি নিজেও) তার ওপর অবিচল থেকো।”(সুরা ২০; ত্বাহা ১৩২)(৭) ঈমান ও কাজকর্মে দৃঢ়তা এনে দেয় সালাত।“আসলে) মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে ভীরু জীব হিসেবে, যখন তার ওপর কোনবিপদ আসে তখন সে

ঘাবড়ে যায়, (আবার) যখন তার সচ্ছলতা ফিরে আসে তখনসে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করে। কিন্তু সেসব লোকদের কথা আলাদা যারা সালাত আদায় করে। যারা নিজেদের সালাতে সার্বক্ষণিকভাবে কায়েম থাকে।" (সূরা ৭০;মাআরিজ ১৯-২৩)আমরা যদি এ আলোকগ্রন্থ তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করি, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাব,ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে আমরা কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

কুরআনে নামাযের আদেশ:

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাযের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাজের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন- তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকুকর।

সূরা বাকারা (২): তোমরা আল্লাহর পথে সাধনা কর, যেমন সাধনা করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন (-কে আঁকড়ে ধর)। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম, পূর্বেও এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীহয় আর তোমরা (অন্যান্য) মানুষের জন্য সাক্ষী হও। সুতরাং তোমরা নামায কায়েমকর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মজবুত ভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক । তিনি কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী ।সূরা হজ্ব (২২) : ৭৮এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে (উম্মতে মুহাম্মাদী) সাক্ষী সাব্যস্ত করেছেন।কিয়ামতের দিন যখন অন্য উম্মতেরা অস্বীকার করে বলবে যে, নবীগণ আমাদের নিকট দ্বীনের কথা পৌঁছাননি তখন উম্মতে মুহাম্মাদী নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে-নিশ্চয় নবীগণ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নিয়ামত। এ নিআমতের শোকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামায কায়েম করা,যাকাত আদায় করা এবং তাকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।এ থেকে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি এও বোঝা যায়, এইনিআমতের শুধু মৌখিক শোকরিয়া আদায় করা যথেষ্ট নয়; বরং আমলগতভাবেওশোকরিয়া আদায় করতে হবে। যে সকল আমল দ্বারা এ নিআমতের শোকরিয়া আদায়করা যায় তার শীর্ষে রয়েছে নামায, যাকাতসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণকরা।অপর আয়াতে নবাজীকে লক্ষ্য করে বলেছেন- আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করেএবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে,সেই

দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবেনা।সূরা ইবরাহীম (১৪) : এখানে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকেনামাযের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবংকিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি রাসূল নামাযের আদেশ করেছেন- তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং ফজরেরনামায (কায়েম কর)। নিশ্চয় ফজরের নামাযে সমাবেশ ঘটে।সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৭৮সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম দ্বারা কোন্কোন্ নামাযবুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্টবিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায । আর ফজরেরনামাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশকরে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।রাসূল ৯ কে নামাযের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন- তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে । নিশ্চয় নেকআমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক।-সূরা হুদ (১১) : ১১৪ দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর,মাগরিব ও এশার নামায বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতও সুন্্াক্ষ এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।রাসূল ৬ কে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- এওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত কর ওনামায কায়েম কর। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আরআল্লাহর যিকিরই সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন।সুরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫আল্লাহ বলেন- হে নবী পত্রীগণ, তোমরা সাধারণ কোনো নারীর মত নও যদি তোমরা তাকওয়াঅবলম্বন কর। তোমরা কোমলভাবে কথা বলো না, অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি আছেসে লালসায় পড়বে আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বল। এবং তোমাদের ঘরে অবস্থানকর। প্রাচীন জাহিলিয়াতের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িও না এবং নামায কায়েমকর। যাকাত আদায় কর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার!আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তমভাবেপবিত্র করতে ।-সুরা আহযাব (৩৩) : ৩২-৩৩আদেশমাত্রই গুরুত্বপূর্ণ । আদেশকারীর মর্ধাদা এবং আদেশের ধরন ও অবস্থা অনুপাতেগুরুত্ব আরো বেশি হয়। আদেশকারী যত বড় হয় আদেশ তত বেশি গুরুত্ব বহনকরে। এমনিভাবে যখন বারবার ও বিভিন্নভাবে আদেশ করা হয় তখনো আদেশেরগুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নামাযের আদেশ যেহেতু স্বয়ং আল্লাহ করেছেন যিনি সবচেয়ে বড়এবং বিভিন্নরূপে করেছেন, সরাসরি বান্দাদের করেছেন, নবীর মাধ্যমে করেছেন,সরাসরি নবীকে করেছেন, নবীপত্রীদের করেছেন, তাই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ববেশি।

নামাজ পড়ার নির্দেশ:

আমর ইবনে শুয়াইবের দ্বারা তার পিতা হতে বর্ণিত, তার দাদা বলেছেনঃ আল্লাহররাসূল বলেছেনঃ তোমাদের শিশুদেরকে সাত বছর বয়সে (ফরজ) নামাজের নির্দেশদাও, আর দশ বছর বয়স থেকে তাদের প্রহার কর যদি তারা তা না করে, আরতাদেরকে নিজ নিজ বিছানায় আলাদা করে দাও ।"আবু দাউদ (৪৯৫

হাদীস শরীফে নামাজের গুরুত্ব:

(১ প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিকপাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।(বুখারী: ৫২৮)(২) কবীরা গুনাহ না করলে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআবারের জুমুআ আদায়-এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে যাওয়া পাপরাশি এমনিতেই মুছে যায়।(মুসলিম: ২৩৩)(৩) কোন মুসলিম যখন ভালো করে ওযু করে পাঁচ বেলা সালাত আদায় করে। তারপাপরাশিগুলো এমনভাবে ঝরে যায়, যেমনভাবে শুষ্ক ডালা থেকে এর পাতাগুলো ঝরেযায়।(সহীহ তারগীব: ৩৫৬)(৪ যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়েযাবে ।বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না।(সহীহ তারগীব: ৩৬৯)।(৫) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমিযখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটামর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম: ৪৮৮)(৬) সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনারসাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর(অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)। (মুসলিম: ৪৮৯)।(৭) যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতিপদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী: ৬৪৭)।(৮) জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়াহয় (বুখারী: ৬৪৭)। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। (বুখারী)(৯) নবী (স) তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে(সালাতের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদদাও। (সহীহ তারগীব: ৩১০) (১০)যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করেতাহলে তার নাম ইল্লিয়্যিনে লেখা হয়।(সহীহ তারগীব: ৩১৫)(১১) যে লোক এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকে যেন তার কলবমসজিদের সাথে ঝুলে আছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে আরশেরছায়ার নিচে জায়গা দেবেন।(বুখারী: ৬৬০)(১২) মসজিদ হলো প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ লোকের ঘর। যে ব্যক্তির ঘর হবে মসজিদ, সেইব্যক্তির জন্য রয়েছে আরাম, দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের পথে আল্লাহ এ ব্যক্তিকেপুলসিরাত পার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন (সহীহ তারগীব: ৩২৫)।(১৩) ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের ফযীলত দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তারচেয়ে উত্তম

(মুসলিম)।(১৪) যেসব লোককে জান্নাতে নেবেন বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নামাধীরাতাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায় ।(আবু দাউদ)(১৫) সালাত কিয়ামতের দিন বান্দার ঈমানের দলীল হয়ে যাবে। বান্দা তখন তারসামনে নূর ও জ্যোতি দেখতে পাবে।১৬) সালাতে সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহর একদমকাছে চলে যায় ।(মুসলিম)।(১৭) সালাত হলো বান্দার মন্দ কাজের কাফফারা যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত নাহয়। (মুসলিম)(১৮) সালাত আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম আমল হিসেবে গৃহীত (বুখারী)(১৯) সালাত হলো নয়ন জুড়ানো ও চক্ষু শীতলকারী ইবাদত। (নাসাঈ)

ইসলামে নামাজের গুরুত্ব ও সৌন্দর্য:

ইসলামের প্রত্যেকটি বিধান ও আমলের মাঝেই যৌক্তিকতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে।ইসলামে এমন কোন আমল নেই যা মুসলমানের জন্য পালন করা কষ্টকর হয়ে পড়বে ।ইসলামে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। এই পাঁচটিস্তম্বের মধ্যে "কালেমা" যার মাধ্যমে মানুষ স্বীকারে করে নেয় যে তার প্রভূ একমাত্রআল্লাহ। কালেমার পরই নামাজ অন্যতম একটি স্তম্ব এবং ইসলামে নামাজের প্রতিবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাববুল আলামিন বলেন,'আমি জ্বিন জাতি ও মানব সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতেরউদ্দেশ্যে। (সুরা যারিয়াত : ৫৬)।ইসলামের পাঁচটি স্তম্বের মধ্যে নামাজ এবং রোজা ধনী, দরিদ্র সকলের জন্যই ফরজ।তবে হজ্জ এবং যাকাতের বিধান শুধুমাত্র ধনী ব্যাক্তিদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।শারীরিক অসুস্থতাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফরজ রোজা ভঙ্গ করার হুকুম রয়েছে এবংপরে তা আদায় করে নেওয়া যায়। রোজা ভঙ্গের পর অক্ষম ব্যাক্তি ফকির, মিসকিনকেপেট ভরে খাবার খাওয়ানোর মাধ্যমে রোজার কাফফারা আদায় করতে পারবেনএইরকম বিধানও ইসলামে রয়েছে। তবে নামাজের ক্ষেত্রে কাযা করার হুকুম শুধুমাত্রবিশেষ ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে এবং নামাজের কোন কাফফারা বা বদলা হয় না। বলাহয়েছে যদি পানির অভাবে নামাজ কাযা হবার সম্ভবনা থাকে তবে সে যেন তাইমুমকরে নামাজ আদায় করে। যদি কোন ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারে সে যেনবসে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। যদি কারো বসে বসে নামাজ পড়তেও কষ্টকরহয়ে পড়ে তারপরেও সে যেন শুয়ে নামাজ আদায় করে। এমনকি চোখের ইশারায়নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে।দেহে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত কোনো অবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য নামাজ না পড়ার বা বাদদেওয়ার বিধান নেই। জ্ঞানসম্পন্ন অসুস্থ অবস্থায়ও নামাজ আদায় করতে হবে । অর্থাৎইসলামে সুস্থ ব্যক্তির জন্য যেমন নামাজের নিয়ম ঠিক করে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবেঅসুস্থ ব্যক্তির নামাজের ব্যাপারেও কিছু নিয়মনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। ইসলামেনামাজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল যা পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জন্য ফরজ।প্রতিটি মুমিন মুসলমানের জন্য ঈমানের গ্রহণের পর প্রথম এবং প্রধান ইবাদত

নামাজ।নামাজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী যথা সময়েনামাজ আদায় করাও জরুরি। কেননা পরকালে সকল মুসলমানদের কাছে সর্বপ্রথমনামাজের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যে ব্যক্তির নামাজের হিসাব দিতে সহজ হবে, তাঁরপরবর্তী সকল হিসাব সহজ হয়ে যাবে।নামাজ আদায়ের সময় তা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে আদায় করতে হবে । নামাজ আদায়েদায়সারা ভাব দেখানো মোটেই উচিত নয়। নামাজের সবগুলো বিধান মেনে সঠিকভাবেনামাজ আদায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধ্যান রেখেপরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্রকোরআনে বর্ণিত হয়েছে, "সেসব মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়াবনতথাকে।" (সূরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২)।সঠিকভাবে নামাজ আদায় ও মনোযোগ ধরে রাখার ব্যাপারে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত উপদেশ কামনা করলে তিনি তাকেবলেন, "যখন তুমি নামাজে দন্ডায়মান হবে তখন এমনভাবে নামাজ আদায় করো, যেনএটিই তোমার জীবনের শেষ নামাজ।' -ইবনে মাজাহ, মিশকাত, হাদিস : ৫২২৬)।এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন,যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (বিশ্বাসরাখবেন যে) তিনি অর্থ্যাৎ আল্লাহ আপনাকে দেখছেন।নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।প্রতিদিন সিজদা দিয়ে বান্দা এটিই প্রমাণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর কাছেইআত্মসমর্পণ করেছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আনুগত্য করে না। একমাত্রনামাজের মাধ্যমেই মহান রবের কাছাকাছি আসা যায়। একমাত্র নামাজের মাধ্যমেইবান্দা তার প্রভুর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পায়। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্যহচ্ছে কোন দালাল ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর সাথে বান্দা নামাজের মাধ্যমে সাক্ষাৎকরতে পারে এবং নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে।এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে মুমীমগণ তোমরা ধৈর্য্যও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।নামাজের মধ্যে অন্যতম একটি সৌন্দর্য হচ্ছে নামাজের সময় সকলেই সকল ভেদাভেদভুলে গিয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে। এক কাতারে যেমন গরিবব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পরনে জীর্ণ শীর্ণ ছেড়া কাপড় ঠিক একই নামাজের কাতারে একজনধনী ব্যাক্তি দাঁড়ায়, যাঁর পড়নে দামী কাপড় ও সুগন্ধি ।শুধু ধনী গরিব নয় ছোট-বড়, বন্ধু-শত্রু, উর্ধ্বতন কর্মকতা - নিম্নতম কর্মচারী, ফকির-বাদশা মোটকথা সকল মুসলিম সব বিভেদ ভুলে গিয়ে মহান রবের ডাকে সাড়া দিতেএক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়। সকলেই আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে প্রকাশ্যে মাথা নত করে।এটিই নামাজের আসল সৌন্দর্যের প্রতিফলন । নামায সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল এবংবেহেস্তের চাবিকাঠি। আর তাই এজন্যই বলা যায়, নামাজ হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুলআলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার।

নামাজ গুরুৎপূর্ণ হওয়ার কারন:

নামাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, “নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকেবিরত রাখে।' (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫)“যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে আমি এরূপসৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না' (সুরা আরাফ, আয়াত-১৭০)।'মুমিনরা নামাজ আদায় করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলেরআদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন" (সূরাতাওবা, আয়াত-৭১)।মানুষের জীবনে কোনো বিপদ-আপদ এলে একজন প্রকৃত মুমিন বান্দার উচিত ধৈর্য্যধারণ করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং অবশ্যই তা নামাজের মাধ্যমে ।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, “হে ঈমানদারগণ! সবর ও নামাজের দ্বারা সাহায্যগ্রহণ করো, আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৫৩)।“অশান্তি বা গোলযোগের সময় হলে পায়ে হেটে অথবা বাহনে চড়ে যেভাবেই সম্ভবনামাজ পড়ো । আর যখন শান্তি স্থাপিত হয়ে যায় তখন আল্লাহকে সেই পদ্ধতিতে স্মরণকরো, যা তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন, যে সম্পর্কে ইতঃপূর্বে তোমরা অনবহিত ছিলে'(সুরা বাকারা, আয়াত-২৩৯)।'নামাজ কায়েম করো এবং তাঁর নাফরমানি করা থেকে দূরে থাকো। তাঁরই কাছেতোমাদের সমবেত করা হবে' (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-৭২)।“বলো, আমার নামাজ, আমার ইবাদতের সমস্ত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছুআল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য' (সূরা আল আনয়াম, আয়াত-১৬৩)। “আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তুমি আমার ইবাদতকরো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামাজ কায়েম করো" (সূরা ত্বহা, আয়াত-১৪।নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রাসূল সা: বলেছেন 'নামাজ বেহেশতের চাবি'। দৈনিকপাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তার বান্দার সরাসরি যোগাযোগস্থাপিত হয়। আর এ জন্যই একজন মুসলিমের জীবনে নামাজের গুরুত্ব অনেক, কারণমহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় ইবাদত হলো নামাজ।হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা:কেজিজ্ঞাসা করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল) আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমলকোনটি? রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'নামাজ' । (বুখারি ও মুসলিম)নামাজ এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে কুফর এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য করা যায়।কোন ব্যক্তি ইমানদার আর কোন ব্যক্তি কাফির তার স্পষ্টত ফারাক হলো নামাজ।কারণ মুমিন ব্যক্তি যেকোনো অবস্থাতেই প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ আদায় করবে, আরকাফির ব্যক্তি নামাজ থেকে দূরে থাকে।এ সম্পর্কে জাবির রা: বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সা: নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনাকরতে গিয়ে বলেছেন, কুফর ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ত্যাগ করা।(সুনানে তিরমিজি-২৬১৮, সহিহ ইবনে মাজাহ-১০৭৮, মুসলিম)হুসায়ন ইবনে হুরায়স রহ. বুরায়দা রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সা:বলেছেন, “আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যেসালাত ছেড়ে দিলো সে কুফরি করল।' (সুনানে নাসায়ি-৪৬৪, সহিহ ইবনে মাজাহ-১০৭৯)

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের আগে-পরে ১২ রাকাত সুন্নত নামাজ রয়েছে,যার গুরুত্ব অপরিসীম। শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নত বলা হয়, ওই আদেশমূলকবিধানকে, যা ফরজ-ওয়াজিবের মতো অপরিহার্য না হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরনিয়মিত আমল থেকে তা প্রমাণিত। -(ফিকহুস সুন্নাহ, ১৬০)সুন্নত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিন কারও ফরজ নামাজেঘাটতি থাকলে, এ নামাজ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সেই ঘাটতি পূরণ করবেন।সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরজ নামাজে কোনও কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তায়ালাফেরেশতাদের বলবেন, “দেখ, আমার বান্দার কোনও নফল (নামাজ) আছে কি না।অতএব তার নফল নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর অন্যআমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।” -(সুনানে আবু দাউদ, ৭৭০, তিরমিজি, ৩৩৭, ইবনেমাজাহ, ১১৭)উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলো,জান্নাতে তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজনামাজের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পরদুই রাকাত, ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত। -(তিরমিজি, কিতাবুস সালাত, ১/৪৪০,৪৪৫)আম্মাজান হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিন-রাতে ১২ রাকাতনামাজ পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; জোহরের (ফরজ নামাজের) আগে চার রোতও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের(ফরজের) আগে দুই রাকাত ।”-(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৫৭৭)

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

নফল আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, এচ্ছিক ও অতিরিক্ত । ইসলামেরপরিভাষায়, ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলামী শরিয়ত প্রবর্তিত বিধান বা বিষয়কেনফল বলা হয়। (মুজামুত তারিফাত, পৃ. ২৬৬)যে আমল রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত করতেন এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন তাকেমুস্তাহাব, নফল বা মানদুব বলা হয়।নফল নামাজের দ্বারা মূলত আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বতের পরিমাপ করা হয়।সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে ভালোবাসার বিষয়টি যাচাই হয়। বিষয়টি উদাহরণ দিয়েএভাবে বোঝানো যায় যে, মালিকের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের দৈনিক কাজের রুটিনঠিক করে দেওয়া হয়; যা তাকে

অবশ্যই করতে হবে। আর মুমিন জীবনের শ্রেষ্ঠতমইবাদত ফরজ।নফল আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ, এচ্ছিক ও অতিরিক্ত । ইসলামেরপরিভাষায়, ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলামী শরিয়ত প্রবর্তিত বিধান বা বিষয়কেনফল বলা হয়।(মুজামুত তারিফাত, পৃ. ২৬৬)যে আমল রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিত করতেন এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন তাকেমুস্তাহাব, নফল বা মানদুব বলা হয়।এমন বিধানের ওপর আমল করা প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ। এর ত্যাগকারীকেতিরস্কার করা যাবে না। যথা তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য নফল নামাজ, নফল রোজা, নফলসদকা, নফল হজ ইত্যাদি।নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম ।নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো-_

ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ : হাশরের ময়দানে ফরজ সালাতের ঘাটতি পূরণ হবেনফল সালাত দ্বারা। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি,কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তারসালাতের হিসাব সঠিক হয়, তাহলে সে সফল হবে ও নাজাত পাবে । আর যদি সালাতবিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।যদি ফরজ সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহলে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমারবান্দার কোনো নফল ইবাদত আছে কি না? তখন নফল দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণকরা হবে । অতঃপর তার অন্য আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে । (তিরমিজি, হাদিস: ৪১৩)

আল্লাহর ভালোবাসা লাভ : নফল সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরঅন্তভূক্তি হতে পারে । আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয় বান্দার সঙ্গে শত্রুতা করল, আমি তারবিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরজ করেছি, তার মাধ্যমে আমারনৈকট্য অনুসন্ধানের চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নেই।বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমিতাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়েযাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই,যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সেআমার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সেআশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। (বুখারি, হাদিস : ৬৫০২)রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য : জান্নাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এরসঙ্গে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে,যারা অধিক হারে নফল সালাত আদায় করবে। রবিআ বিন কাব (রা.) বলেন, আমিরাতের বেলা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম এবং অজুর পানিসহ অন্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বলেন, (কল্যাণের কিছু)চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বলেন,এ ছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি

বলেন, তুমি বেশিবেশি সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করো। (মুসলিম, হাদিস : ৯৮১)

ফজিলতপূর্ণ কিছু নফল নামাজ:

নিম্নে কিছু নফল সালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

তাহাজ্জুদ :ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ নামাজ হলো তাহাজ্জুদ। পবিত্র কোরআনেতাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, “তারা শয্যা ত্যাগকরে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশঙ্কায়। আর আমি তাদের যে রিজিকদিয়েছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। (সুরা : সিজদা, আয়াত : ১৬)মধ্য রাতের পর বা শেষ রাতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তাহাজ্জুত সালাত দুই থেকে আটরাকাত পড়া যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, রমজানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হলো আল্লাহরমাস মহররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের(তাহাজ্জুদের) নামাজ। (মুসলিম, হাদিস : ১১৬৩)

ইশরাক: ইশরাক : সূর্য পরিপূর্ণভাবে উদিত হওয়ার পর ইশরাকের নামাজ আদায়করতে হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্তমসজিদে অবস্থান করতেন। এ সময় দোয়া, তাসবিহ পাঠ ও দ্বিনি আলোচনা করতেন।সূর্যোদয়ের পর তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এই আমলের প্রতি রাসুলুল্লাহ(সা.) অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত,রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করল এবংসূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর জিকিরে বসে থাকল; অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায়করল, সে একটি পরিপূর্ণ হজ ও ওমরাহর সওয়াব পাবে ।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ৫৮৬)

দুহা : সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার আগমুহূর্তে “দুহার নামাজ আদায় করা হয়।অনেক আলেমের মতে, ইশরাক ও দুহা পৃথক নামাজ। কেউ কেউ বলেছেন, সময়েরশুরুতে আদায় করলে সেটা ইশরাক আর সময়ের শেষে আদায় করলে দুহা। আবুহুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেনআমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা, দুহারনামাজ ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা । (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮)

আউয়াবিন : মাগরিব ও এশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়কৃত ছয় রাকাত নামাজ“আউয়াবিন' নামে পরিচিত। আল্লামা মাওয়ার্দি এই অভিমত প্রাধান্য দিয়েছেন।(মুগনির মুহতাজ : ১/৩৪৩)রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ আদায় করবেএবং এগুলোর মধ্যে কোনো মন্দ কথা না বলে, তার আমলনামায় ১২ বছর ইবাদতেরসওয়াব লেখা হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১১৬৭)

তাহিয়্যাতুল অজু : অজুর মাধ্যমে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপদুই রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল অজু । নিষিদ্ধসময়ের বাইরে যেকোনো সময় এই নামাজ আদায়ের অবকাশ আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)বলেন, যে ব্যক্তিউত্তমরূপে অজু করল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দুই রাকাত নামাজ আদায় করল তার জন্যজান্নাত ওয়াজিব। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৪)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ : মসজিদে প্রবেশ করার পর আদায় করার নামাজ । নিষিদ্ধ সময়ছাড়া অন্য সময়ে মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যায়। তবে নামাজেরজামাত ও ওয়াক্তের নির্ধারিত সুন্নত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাহিয়্যাতুল মসজিদপড়বে না। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুইরাকাত নামাজ আদায় করার পর বসে । (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৬৭)

তাওবার নামাজ : তাওবা বা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যে সালাত আদায় করা হয় তাকেসালাতুত তাওবা বলা হয়। আবু বকর (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতেশুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি গুনাহ করে, অতঃপর উঠে দাঁড়ায় এবং পবিত্রতা অর্জনকরে আর দুই রাকাত সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনু মাজাহ, হাদিস : ১৩৯৫)

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সালাত : সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহরবিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) সফর থেকে ফিরে সাধারণতপ্রথমে মসজিদে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করে তারপর বাড়িতে প্রবেশকরতেন।(বুখারি, হাদিস : ৪৪৩, ৪৬৭৭)

নামাজের পুরস্কার :

নামাজিদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হলো-তাদেরকে নিজের নৈকট্য প্রদান। পবিত্র কোরআনের সুরা আলাকে আল্লাহতায়ালা নবীকরিমকে (সা.) তার (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের জন্য নামাজ ও সিজদা আদায়ের নির্দেশদিয়েছেন। মহান আল্লাহর নেয়ামতগুলোর মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভ একটি তুলনাহীনও অমূল্য নেয়ামত।আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেছেন যে: আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়া সাল্লাম(তার উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও শান্তি বর্ষিত হোক), বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি প্রথমতাকবীর ধরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহর জন্য জামাতে (৫ ওয়াক্ত ফরজ) নামায আদায়করে, তার জন্য দুটি নাজাত লেখা হয়ঃ জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকেমুক্তি।_জামে আত-তিরমিষী ২৪১, সহীহা ১৯৭৯, সহীহ আত-তারগীৰ ৪০৯, সহীহ আল-জামি। ৬৩৬৫সাহাবাদের নামাজ:সাহাবারা নবীজির কাছ থেকে নামাজ আদায়ের পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি লাভের উপায়শিখেছিলেন। ঘরে, বাইরে, যুদ্ধের ময়দানে সর্বক্ষেত্রে এর প্রমাণ দিয়েছেন তারা।এমনকি শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর শরীরে বিদ্ধ

হওয়া সত্তেও নামাজে পূর্ণ খুশু বজায়রাখতেন।হজরত তালহা (রা.) ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি। একবার নামাজের প্রতিমনোযোগে ঘাটতি হওয়ায় তিনি তার প্রিয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দান করেদিয়েছিলেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আবু তালহা আনসারী(রা.) একবার তার এক বাগানে নামাজ আদায় করছিলেন। তখন একটি ছোট পাখিউড়তে শুরু করল (বাগান এত ঘন ছিল যে এই ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না),তাই পাখিটি এদিক-সেদিক বের হওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করল। এই দৃশ্য তার খুবভালো লাগল। ফলে তার মনোযোগ কিছুটা সেদিকে চলে গেল। তারপর আবারনামাজের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তিনি স্মরণ করতেপারছিলেন না, নামাজ কত রাকাত আদায় করেছেন। বাগানের এ সম্পদ যেন তাকেপরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে!হজরত তালহা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বাগানে তারসম্মুখে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল তা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহররাসুল! যে সম্পদ আমার নামাজের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে তা আমি আল্লাহর জন্যদান করে দিচ্ছি। আপনি যেখানে পছন্দ করেন তা সেখানে ব্যয় করুন। (মুয়াত্তা ইমামমালিক : ২১৪)অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে হজরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এরসঙ্গে জাতুর-রিকা যুদ্ াভিযানে বের হলাম। তখন আমাদের এক ব্যক্তি মুশরিকদেরএক লোকের সঙ্গীকে হত্যা করে। ফলে ওই মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণপর্যন্ত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কোনো সঙ্গীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষ্যান্তহব না। তখন সে নবী (সা.)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নবী (সা.) এক জায়গায়অবতরণ করে বললেন, এমন কে আছ, যে আমাদের পাহারা দেবে? তখন মুহাজিরদেরথেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন,তোমরা দুজন গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাকবে। তখন উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলেমুহাজির সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী সাহাবি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ে মশগুলহয়ে পড়েন। এমন সময় ওই লোকটি এসে দূর থেকেই আনসারী সাহাবিকে দেখেচিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তারপ্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার শরীরে এসে বিধে গেল। তিনি তা বের করেনিলেন । মুশরিক ব্যক্তি একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল । তিনি রুকু সিজদা করে(যথারীতি নামাজ শেষ করে) সঙ্গীকে জাগালেন।মুহাজির সাহাবি জেগে উঠে তার রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথমতীর নিক্ষেপের পরই আমাকে ডাকেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাজে) এমনএকটি সুরা তেলাওয়াত করছিলাম যা ছাড়তে আমি পছন্দ করিনি।' (আবু দাউদ :১৯৮)সাহাবায়ে কেরামের নামাজের এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। তাদের নামাজ ছিলসত্যিকার অর্থেই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। আমাদের নামাজও যেন হয় এমন খুশু-খুঁজুরঅনুভূতিতে পূর্ণ। যারা এমন নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাদের জন্য সফলতারসুসংবাদ দিয়ে বলেছেন "সফলকাম ওইসব মুমিন, যারা তাদের নামাজে খুশুখুজু (পূর্ণমনোযোগ) অবলম্বন করে।' (সুরা মুমিনুন : ১-২)নামাজে দাঁড়িয়ে মুসল্লিরা মূলত মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কথোপকথন করেন।হজরত

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “তোমাদেরকেউ যখন নামাজে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার প্রতিপালকের সঙ্গে কথোপকথন করে!"(বোখারি : ৪১৩)।আর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে কতটা ভয় ও মনোযোগী হওয়ারদরকার নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারেন! সাধারণ দুনিয়ার রাজা-বাদশার সামনে কথাবললে মানুষ কতটা জড়োসড়ো হয়! সে তুলনায় দুনিয়ার বাদশারও বাদশা- আকাশ-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, দুনিয়া-আখেরাত সবকিছুর বাদশা মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ালেআমাদের অবস্থা কেমন হওয়া চাই! অবশ্যই মনোযোগের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে। তাঁরপ্রতি মনোনিবেশ রাখতে হবে।

অতীত যামানার নেক বান্দাগণের সালাত:

অতাত যামানার নেক বান্দাগণ কতটুক মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করতেন?তা আলোচনা করা হলো...

(১ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র) চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার ফজরের নামাযের কোন দিনজামাআত ছুটেনি।

(২) ওয়াকী ইবনে জাররাহ বলেন, আমাদের বয়স যখন প্রায় সত্তর বছর, তখনও তারসালাতে কখনো তাকবীরে উলা" ছুটেনি। তাকবীরে উলা' হলো জামাআতে দাঁড়িয়েইমাম সাহেব “প্রথম যে তাকবীরটি" দেয়।

(৩) আলী ইবনে হুসাইন বিন যাইনুল আবেদীন যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তারশরীরে কম্পন শুরু হয়ে যেত। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,তোমরা কি জান না যে, আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই? এবং কার সাথেকথাৎেপকথন করি? আরেকবার তাঁর নামাযে সিজদারত অবস্থায় তার বাড়িতে আগুনলেগে গিয়েছিল। এমন সময় সিজদা থেকে মাথা উঠালেন যখন আগুন নিভে গিয়েছিল ।বিষয়টি তাকে বলা হলে তিনি বলেন, আরেকটি আগুন আমাকে এ আগুন থেকে বিমুখকরে রেখেছিল।

(৪) মুসলিম ইবনে ইয়াসার আল-বাসারী যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন মনে হতো একখণ্ড কাঠ দাঁড়ানো আছে। সামান্যতম কোন নড়াচড়া ছিল না। নামায শুরুর সময় তারপরিবারের লোকদেরকে বলতেন তোমরা তোমাদের কথাবার্তা বল। আমি এখনতোমাদের কথা শুনি। কেননা, নামাযে তিনি তখন আল্লাহর সাথে কথাবার্তায় মগ্ন ।

(৫) আমাশ বলেন, 'ইবরাহীম আত্-তাইমী যখন সিজদা করতেন তখন মনে হতোতিনি যেন একটা দেয়ালের অংশ। এ অবস্থায় চড়ইগাখি তার পিঠে এসে বসে যেতো।

(৬) ইয়াকুব ইবনে ইয়াজীদ বাসরীর নামাযরত অবস্থায় একবার তার কাঁধ থেকে চাদরচুরি হয়ে যায় এবং পরে আবার তাকে তা ফেরতও দেওয়া হয়। কিন্তু নামাযে গভীরমনোযোগ থাকার কারণে তিনি তা টের করতে পারেননি ।
(৭) মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন নাসের মারওয়াবীকে তারনামাযরত অবস্থায় দেখেছি, তার কানে মাছি বসেছে, আর রক্ত বয়ে যাচ্ছে। তবুও তিনিমাছি সরাতেন না। এমন খুশূ-খুযু ও মনোযোগ ছিল তাদের নামাযে।

নামাজে মনোযোগের কৌশল:

দৈনন্দিন জীবনে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ব্নিতা, অলসতা ও নানা ধরনের চিন্তারসম্মুখীন হতে হয় আমাদের । এর প্রধান কারণ হলো সালাতে একনিষ্ঠতা, মনোযোগনা থাকা।একনিষ্ঠ ছাড়া সালাত কখনো আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরাএকনিষ্ঠতার সঙ্গে আমার ইবাদত কর। (সুরা বাইয়্যিনা-৫)সালাতে পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ সাধনের কিছু কৌশল:প্রথম কৌশল হলো, অন্তরের মধ্যে এই অনুভব করা এটা শেষ নামাজ। মৃত্যু এমনএকটি বিষয়ের যা কখন আসে বলা যায় না।দুনিয়া এখন গ্লোবাল ভিলেজের মাধ্যমে হাতের মুঠোয়, কিন্তু মৃত্যু এর বাহিরের একটিঅজানা-অধরা বিষয়।সালাতে যখন দাঁড়াবে তখন এটা অনুভব করতে হবে এটাই বিদায়ী নামাজ। রাসূল(সা.) বলেছেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াও তখন তুমি বিদায়ী সালাত পড়। (মুসনাদেআহমদ)। হতে পারে এটি জীবনের শেষ নামাজ।সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির দ্বিতীয় কৌশল হলো, এ অনুভব করা সালাত হলো আল্লাহরসঙ্গে বান্দার কথোপকথনের মাধ্যম।সালাতের মাধ্যমে গোলাম ও মনিবের মাঝে কথা বলা যায়। যদিও সেটা আমাদেরশ্রবণ হয় না, তবুও এ মনোভাব ধারণ করতে হবে অন্তর দ্বারা আমরা কথা বলছি।আল্লাহতায়ালা বলেন, বান্দা যখন নামাজ পড়ে তখন তা আমি আধা-আধি ভাগ করিএবং তার কথার উত্তর দিয়ে থাকি। (বুখারী)বান্দা যখন বলে, সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি এই বিশ্বজগতের মালিক। তখনআল্লাহ বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা আদায় করেছে।এভাবে প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে থাকেন। এই অনুভবটা অন্তরের মাধ্যে লালন করতেপারলে নামাজে মনোযোগ বৃদ্ধি হবে।সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির তৃতীয় কৌশল হলো, ধীরস্থির হয়ে সালাত আদায় করা।সালাত মুমিন জীবনে সবরের (ধৈর্য) শিক্ষা দেয়।সালাত নম্র-ভদ্র হয়ে বিনয়ের সাথে আদায় করতে হয়।আল্লাহতায়ালা বলেন, মুমিনরা তাদের সালাতে বিনয়ী অবলম্বন করে। (সুরা মুমিনুন-০২)যৎত্রসহকারে সালাত আদায় না করলে সালাতে মনোযোগ সাধন হবে না। কেরাত, রুকুও সেজদায় ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হবে।রাসূল (সা.) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর ওই ব্যক্তি যে, ধীরস্থিরভাবেনামাজ পড়ে না ও রুকু সেজদায় দেরি করে না। (তীবরানি)তাসবিহ তাহলিলগুলো অর্থসহ জানার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করতেহবে; যার ফলে মনোযোগ অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ার সুযোগ থাকবে না।সালাতে মনোযোগ

বৃদ্ধির চতুর্থ কৌশল হলো এ অনুভব করা- আমি আল্লাহর সঙ্গেদেখা করছি।আল্লাহতায়ালা সার্বক্ষণিক আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন কিন্তু দুনিয়ার কোনো চর্মচক্ষু দ্বারাতাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব না।সালাতের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এমনভাবে, যেনতাঁকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর যদি দেখতে না পাও, তবে তিনি যেন তোমাকেদেখছেন। (বুখারি, মুসলিম)আল্লাহর সামনে যখন মাথানত করতে হয় তখন এই ভয়ে করতে হবে তিনি যেনআমাকে দেখতে পাচ্ছেন।পৃথিবীর সব চোখ এড়ানো যায় কিন্তু আল্লাহর চোখ কখনো এড়ানো সম্ভব নয়। বান্দাযখন সেজদা দেয় তখন আল্লাহর কুদরতি পায়ের উপরে সিজদা দেয়।সুতরাং এক্ষেত্রে খুবই সজাগ থাকতে হবে। এই অনুভব লালন করতে পারলে ভয়বৃদ্ধি পাবে ও পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ সাধন হবে।সালাতে মনোযোগ বৃদ্ধির সর্বশেষ কৌশল হলো- পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।পূর্ববর্তী হলো- সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে-তাবেইন ও বিশিষ্ট ইসলামী স্কলাররা।কারণ তারা সর্বত্র আল্লাহকে বেশি ভয় করে এবং তাদের মতের ভিত্তিতে অসংখ্যমাসয়ালার সমাধান হয়ে থাকে।

নামাজ গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:“যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবারগোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন:না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতওঅনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।নামাযের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। মাসায়িল মোতাবেক নামাযের রোকনগুলো আদায়করার পাশাপাশি অন্তরের ইখলাস ও খুশু-খুযু এবং নামাযের প্রতি মুহাববত নামাযেরপর্ণাঙ্গতার জন্য অপরিহার্য। এই পূর্ণাঙ্গ নামাযের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির নিকটতমসম্পর্ক তৈরি হয়। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত লাভের এবং প্রেমাস্পদেরসঙ্গে যোগাযোগ ও কথোপকথনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম নামায।আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায পড়। (সূরা ত্বহা : ১৪)এক হাদীসে কুদসী থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও মুহাববত সবচেয়েবেশি নামাযের মাধ্যমে, বিশেষত নফল নামাযের দ্বারা অর্জিত হয়। এজন্য নামাযসঠিকভাবে আদায়ের সাথে সাথে অন্তরে নামাযের প্রতি মুহাববত ও ভালবাসা তৈরিকরা জরুরি। নামাষের প্রতি মুহাববতের কারণেই আল্লাহর প্রকৃত নেক বান্দাগণ যখননামাযে দাড়ান তখন তাদের দিলের সব অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর হয়ে যায়। হৃদয়ও মন শান্ত ও প্রশান্ত হয়। দিলে সুকূন ও সাকীনা অনুভব করেন। অপরদিকে কোনোকারণে নামায আদায়ে বিলম্ব হলে কিংবা কোনো অসুবিধা হলে তারা অস্থির ও বিচলিতহয়ে পড়েন।প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের দিকে লক্ষ করলে আমরাদেখতে পাই তিনি বলেছেন- নামাযে আমার চোখের শীতলতা।অন্য এক হাদীসে হযরত বেলাল রা.কে আদেশ করেছেন,

“হে বেলাল! নামায কায়েমকরে আমাদেরকে প্রশান্তি দাও।' (সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১)নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নফল নামাযে দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ থেকেদীর্ঘ কিরাত পড়তেন। কখনও কখনও প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাকাতেসূরা আল ইমরান, তৃতীয় রাকাতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা মায়িদা পড়তেন।তিলাওয়াত করতেন তারতালের সাথে । রহমতের আয়াত এলে থেমে রহমতের জন্যদুআ করতেন, আযাব ও শাস্তির আয়াতে পৌঁছলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে যেত, কিন্তু তিনি নামাযের মধ্যেএমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই হত না।তদপ নামায পড়ায় ব্যঘাত সৃষ্টি হলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন।মক্কার লোকদের সাড়া না পেয়ে অনেক আশা নিয়ে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম তায়েফ গেলেন তখন তারা মক্কাবাসীদের চেয়েও অধিক নির্দয়তার পরিচয়দিল এবং কুরায়েশদের চেয়েও বেশি নিষ্ঠুরতা দেখাল। নবীজী যখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরেআসছিলেন তখন তারা দুষ্কৃতিকারী ও বদমাশদের লেলিয়ে দিল। তারা পাথর ছুড়েছুড়ে নবীজীর দেহ মুবারক রক্তাক্ত করে ফেলল। সেই সঙ্গীন মুহূর্তেও দয়ার নবীতাদের জন্য কোনো বদদুআ করেননি; বরং ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন,এরা আমাকে চিনতে পারেনি, আমার দাওয়াত বুঝতে পারেনি । এদের ভবিষ্যত প্রজন্মআমার ডাকে সাড়া দিবে, আমার দাওয়াত কবুল করবে। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধে যখনতাঁর আসরের নামায কাযা হয়ে গেল, কাফেররা তাঁকে সময়মতো নামায পড়তে দিলনা তখন তাঁর যবান মুবারক থেকে কঠিন বদ দুআ বের হয়ে এল। তিনি বললেন,'আল্লাহ এদের ঘরগুলো ও কবরগুলোকে আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।' সূর্য ডুবেগেল অথচ এরা আমাদেরকে সালাতুল উসতা (আসরের নামায) পড়তে দিল না। (সহীহবুখারী ১/৪১০; সুনানে তিরমিযী ২/১২৭)সাহাবীদেরও নামাযের সাথে ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত ।হযরত আবু বকর রা.-এর নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইররা. বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়েথাকতেন, মনে হত, একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।হযরত ওমর রা.কে যখন কুখ্যাত আবু লুলু খঞ্জর দিয়ে আহত করে তখন তিনি বারবারবেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেতৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি যদি নামায পড়তেই অক্ষম হয়েযাই তবে বেঁচে থেকে আর লাভ কী?এক যুদ্ধের ঘটনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা দুজনসাহাবীকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাজির অপরজনআনসারী । দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের একজন রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাহারা দিবেঅপরজন বিশ্রাম নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন উঠে পাহারা দিবে আর প্রথম জন বিশ্বামনিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের প্রথমভাগে আনসারী সাহাবী পাহারা দেওয়া শুরুকরলেন এবং মুহাজির সাহাবী শুয়ে পড়লেন। আনসারী সাহাবী ভাবলেন শুধু বসে নাথেকে বরং নামায পড়ি। নামায শুরু করার পর শত্রুশিবির থেকে এক কাফের এসেতাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তীর ছুড়ল। তিনি অবিচল দাড়িয়ে থাকলেন। এ দুশমনমনে করল তীর হয়তো

ঠিকমতো লাগেনি। তাই সে আবার তীর ছুড়ল। এদিকে এসাহাবী একভাবেই দাড়িয়ে রইলেন। ওদিকে এ দুশমনও একের পর এক তীর ছুড়তেলাগল। আর তা সাহাবীকে বিদ্ধ করতে থাকল। সাহাবী ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদাআদায় করে যথারীতি নামায শেষ করলেন এবং মুহাজির সাথীকে জাগ্রত করলেন।মুহাজির সাহাবী তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবংঘটনা শুনে বললেন, তুমি আমাকে আরো আগে কেন জাগ্রত করনি? আনসারী উত্তরদিলেন, আমি সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, শেষ না করে রুকুতে যেতে ইচ্ছেহল না। কিন্তু পরে আশঙ্কা হল আমার গায়ে যেভাবে তীর বিদ্ধ হচ্ছে তাতে যেকোনোঅবস্থায় আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। আর তোমাকে জাগানোর আগেই যদি আমিশহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উদ্দেশ্যেপাহারা দিতে বলেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করেফেলেছি। যদি এ আশংকা না হত তাহলে সূরা শেষ না করে আমি রুকুতে যেতাম না।যদিও আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাক না কেন?নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীদের নামায সংক্রান্ত এপবহু ঘটনা কিতাবের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। তদ্রূপ আমাদের সালাফ ওআকাবিরের সম্পর্কেও এ রকম প্রচুর ঘটনা রয়েছে। ছোট্ট একটি ঘটনা:একবার এক বুযুর্গ উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতে কি নামায থাকবে?তাঁকে বলা হল, জান্নাত তো প্রতিদানের স্থান। সেখানে তো নামায পড়তে হবে না। এবুযুর্গ একথা শুনে কাঁদতে আরম্ভ করলেন আর বলতে লাগলেন, তাহলে কীভাবেসেখানে থাকব?নবীজী তো বলেছেন, নামাযে আমার চোখে শীতলতা।নবীজীর সাহাবীরা তো নামায বিহীন জীবনকে অনর্থক মনে করতেন। নামাযের মধ্যেসামান্য অমনোযোগিতার কারণে তাঁরা লক্ষ টাকার বাগান সদকা করে দিতেন। কিন্তুহায়! আমরা তো এতই হতভাগা যে, চক্ষুর শীতলতা লাভ করা তো দূরের কথা, তাঁরাযেমন প্রশান্তি লাভ করতেন, তার মর্ম উপলব্ধি করতেও আমরা অক্ষম। অন্তত তাঁদেরবরকতময় ঘটনাগুলো পড়া ও স্মরণ করার দ্বারা দিলের মধ্যে যদি সামান্য উত্তাপ তৈরিহয় তাতেই বা কম কী?

যে আমল আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহরকাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবললেন, ‘‘নামাজ'। (বুখারি ও মুসলিম)তাই প্রিয়নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) নামাজকে ঈমানের পর স্থান দিয়েছেন। নামাজেরগুরুত্ব ও ফায়েদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে অসংখ্য হাদিন বর্ণনা করেছেন।তন্মধ্যে একটি হলো-হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন হযরত মুহম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহতাআলা মনোনীত সর্বোত্তম আমল হলো নামাজ । অতএব যে বেশি বেশি নামাজ পড়তেসক্ষম, সে যেন বেশি বেশি নামাজ পড়ে । (তাবারানি)প্রিয়নবি হযরত

মুহম্মদ (সা.) নামাজের গুরুত্ব বুঝাতে হাদিসের মাধ্যমে একটি উপমাপ্রদান করেছেনহজরত আবু যর গিফারি (রা.) বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) একসময় শীতকালে বাইরে (কোথাও) তাশরিফ আনলেন । তখন গাছের পাতা ঝরার মওসুমছিল। প্রিয় নবি হযরত মুহম্মদ (সা.) গাছের একটি ডাল হাত দিয়ে ধরলেন। ফলেতার পাতা আরো বেশি ঝরতে লাগল।অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু যর! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি উপস্থিত।তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করলেন-মুসলমান বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ আদায় করে, তখন তার থেকেপাপসমূহ ঝরে পড়ে; যেমন এ গাছের পাতা ঝরে পড়ছে। (মুসনাদে আহমদ)নামাজই একমাত্র ইবাদত; যার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়ার সব কাজ ছেড়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রজন্য নিবেদিত হয়ে যায়। এ নামাজই মানুষকে দুনিয়ার সব পাপ-পংকিলতা থেকে ধুয়েমুছে পাক-সাফ করে দেয়। দুনিয়ার সব অন্যায়-অনাচার থেকে হেফাজত করে।

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় উপকারিতা ও ফযীলত -১ :

দুনিয়া ও আখিরাতে পরকালে নামাজের অনেক উপকারিতা রয়েছে, নিম্নে সংক্ষেপেকতিপয় উল্লেখ করা হলো:

১। নামাজ হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকেজান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ বান্দারওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহরপ্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন... ।” (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী,ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎসালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণেরকারণ হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে সালাতের হিফাযতকরল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।”(ইতোপূর্বে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলাবলেন,:1৭]3এ] (১স্রাও সখ“আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।” [সুরা আল-'আলাক, আয়াত: ১৯]অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁরনৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তীহয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।” (সহীহমুসলিম ও নাসাঈ)

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন: “যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্যউত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল।এ সালাত তার বিগত গুনাহের

কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্তনা হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুরাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি?তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ইবন মাসউদ বলেন, তারপরকোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদবলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ।"(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষুশীতলতা: আল্লাহ বলেন,: "জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।" [সুরা আর-রাণ্দ, আয়াত: ২৮]আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যইপ্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,1245] (৪৭ এশা আও"আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "উঠো বিলাল এবংআমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।" (মুসনাদে আহমদ) এবং নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিতরয়েছে।" (সুনান নাসাঈ)পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহতা'আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদাকরেছেন। তিনি বলেন, "যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমিতাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" [সুরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকেদেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রণায়ভোগে।

নামাজের ইহকালীন ও পরকালীন কতিপয় ফযীলত-২

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা'আলাবলেন,"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত:৪৫]এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিতহতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহুআনহু বলেন, "যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেরসম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন ।" (মুসনাদে আহমদ) সাবেত রহ. বলেন,"নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন।"(তাফসীর ইবন কাসীর)কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের

মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বেবর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিতআল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারেবলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবংবিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,: "নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয়তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেবা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তারনা কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে । নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকেবিপদে-আপদে চিনবে ।" (মুসনাদ আহমদ)অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতেরহিফাযতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।" [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২] আয়াত:ল-হকাল ও পরকালের সফলতা ।"আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করেও সালাত আদায় করে।" [সূরা আল-আ-'লা, আয়াত: ১৪-১৫]আয়াতে উল্লিখিত "ফালাহ" শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণবুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা'আলা বলেন "এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরাতোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণামতো তাকওয়াধারীদের জন্য।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করএমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকেবাঁচার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন "তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠাকর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-'আনকাবূত,আয়াত: ৪৫] অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতিঅনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এজন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেইসালাতের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায়আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরইওসীয়ত করেন এবং বলেন, "যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরেরহয় তখন তাদেরকেসালাতের আদেশ

কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকেসালাতের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"।(সুনান আবু দাউদ)

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব,সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তারজন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তারজন্য কল্যাণকর । কিন্তু বেনামাধীর অবস্থা এর বিপরীত । উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ওঅতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করেতখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়।তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতির্ষ্ঠিত।" [সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়),কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহতাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপকরবেন।" (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলাবলেন,:121] (১৪৮ ০৯৯ আও"আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।" [সূরা আত-তাওবাহ,আয়াত: ১০৮]আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তভুক্ত। কেননা পবিত্রতাঅর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।সালাতের নির্দেশ ও পরিপ্রেক্ষিত : সালাতের নির্দেশ আল্লাহ থেকে মিরাজের সময়হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে । সালাত (নামাজ) মুসলিম জীবনের অপরিহার্য একটিবিষয়, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক,জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং স্বীয় সত্তা ও সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্কেরসেতুবন্ধবিশেষ। হায়াতের প্রতিটি পরতে-পর্যায়ে ও স্তরে সালাতের সঙ্গে সময় সম্পৃক্ত।আল্লাহতাআলা বলেন, নিঃসন্দেহে সালাত বিশ্বাসীর ওপর সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেআবশ্যকীয় করা হয়েছে। (সূরা নিসা,আয়াত-১০৩)। সালাত সময়ানুবর্তিতার শিক্ষাদিয়ে, দায়িত্বপরায়ণতার দীক্ষা দিয়ে, পবিত্র অনুভব ও আবেগের এমন এক স্বর্ণালিশৃঙ্খল রচনা করে, যা আপাতদৃষ্টিতে মানুষকে কেবল শৃঙ্খলিতই করে না; উপরন্ত তাসৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পবিত্র দাসত্বের বন্ধনের মাধ্যমে অপরাপর সব বন্দিত্ব থেকেও যুক্তিদেয়।হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে সালাত প্রতিষ্ঠা করল, সে দীনকে প্রতিষ্ঠা করলআর যে সালাতকে বিনষ্ট করল, সে দীনকেই বিনষ্ট করল। সালাত মনোদৈহিক তথামানসিক, মৌখিক ও দৈহিকের সঠিক সমন্বয়ের একটি সমন্বিত ইবাদত। যার সঙ্গেআর্থসামাজিক অন্যান্য বিষয়ও জড়িত। আর্থিক বিষয়টি হালাল রিজিকেরও অন্তভূক্তিএবং হালাল জীবিকা দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে এবং দৈহিক-জৈবিক পবিত্রতাসালাতের মৌলিক

ও প্রাথমিক শর্তও বটে। নামাজের অন্যতম শিক্ষা 'খুশুখুজ্' (বিনয়ও নম্রতা)। আর একাগ্রতাই সালাতকে প্রাণবন্ত করে তোলে।কেবলই অনুভূতিহীন ঠোঁট নড়াচড়া ও ওঠাবসার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। পবিত্রআমেজ ও আবেগে, অনুভূতিতে, চক্ষু মুদে জাগতিক জগতের চৌহদ্দি ভেদ করেআরশের ফরশে সিজদাহকে পৌঁছাতে পারে; সে-ই সালাতকে প্রাণবন্ত করতে পারে।এরূপ সালাত মানুষের সুস্থ চিন্তা, ইমানি জীবনকে পূর্ণতা দেয়।আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। সেই মহান অস্তিত্বের সঙ্গেআধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিতসালাত আদায় করা এবং স্বীয় সালাতের পবিত্র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পবিত্র জীবনযাপন করা। লৌকিকতার নামাজে কোন পুণ্য নেই। আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনেঘোষণা করেছেন আফসোস! সে সকল নামাজির জন্য যারা তাদের নামাজকে ভুলেথাকে এবং লোক দেখানো নামাজ পড়ে। (সূরা মাউনঃ আয়াত : ৫-৬)

আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম নামাজ:

হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরসঙ্গে আছেন।সালাত এবং “সবর"-এর মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে,এ দু'পস্থায়ই আল্লাহ্তা'আলার প্রকৃত সানিধ্য লাভ হয়। আল্লাহ সবরকারীদের সাথেআছেন বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সালাত আদায়কারী এবংসবরকারীগণের আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ হয়। মহান আল্লাহ আরশের উপর থেকেও তাঁরবান্দাদের সাথে থাকার অর্থ দুটি। প্রথম. সাধারন অর্থে সাথে থাকা। যা সমস্ত মানুষেরক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আর তা হচ্ছে, সবাই মহান আল্লাহর জ্ঞানের ভিতরে থাকা । মহানআল্লাহর যত সৃষ্টি সবার যাবতীয় অবস্থা তাঁর গোচরিভূত।তিনি ভাল করেই জানেন কে কোথায় কোন অবস্থায় কোন কাজে লিপ্ত। দ্বিতীয় প্রকারসাথে থাকা বিশেষ অর্থে। যা কেবলমাত্র তাঁর নেককার, সবরকারী, ইহসানকারী,মুত্তাকীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেটি হচ্ছে, সাহায্-সহযোগিতা করা। মহান আল্লাহরপক্ষে কারও সাথে থাকার অর্থ কখনো এটা হতে পারে না যে, তিনি তার সাথেচলাফেরা করছেন বা কোন কিছুর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন। অথবা তার সাথেলেগে আছেন। কারণ; মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। তিনি শ্রষ্টা হিসেবেসৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

নামায পড়ার নিয়ম:

সালাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তা আদায় করেও অনেকে পাপের ভাগী হবে। আর তা হবে ভয়াবহ জাহান্নাম। তাহলে কীভাবে সে সালাত আদায় করলে আল্লাহর পুরস্কার পাওয়া যাবে, কীভাবে আমাদের রাসূলুল্লাহ (স) তা আদায় করতেন, একমাত্র সেটাই আমাদের অনুকরণ করতে হবে।

তিনি আমাদের নির্দেশ করে বলেছেন, "তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।" (বুখারী- ৬৩১, ইফা-৬০৩, আধুনিক- ৫৯৫) তাহলে তার সালাত আদায় কেমন ছিল এ নিয়েই আমাদের এ ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

১. তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন: প্রথমে ওযু করে পবিত্র হতে হবে। কারণ পবিত্রতাবিহীন সালাত কবুল হয় না (মুসলিম: ২২৪)। তবে কোন কারণে গোসল ফরয হলে, এর পূর্বে অবশ্যই ফরয গোসল সম্পন্ন করে নিতে হবে। ইসলামে যেকোন আমলের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য একটি বিষয়। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য এ বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ফরয।

২. ওয়াক্ত হলে নামায আদায় করা: প্রত্যেক সালাত নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা। তবে আউয়াল ওয়াক্তে অর্থাৎ শুরুর সময়ে আদায় করা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয়। তাকওয়ার দাবি হলো আগে নামায, পরে কাজ। আগে কাজ, পরে নামায নয়। যারা কাজকর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে নামায দেরিতে পড়াকে অভ্যাসে পরিণত করে তারা গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,
"ঐসব নামাযীদের জন্য ওয়াইল বা ধ্বংস, যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল।" (সূরা ১০৭; মাউন ৪-৫)।

আর গাফেল হলো ঐসব লোক, যারা পেছাতে পেছাতে নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ে এবং হুকুম আহকাম গুলো ঠিকমতো আদায় করে না।

৩. কিবলামুখী হওয়া: পূর্ণ দেহসহ কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। (সূরা বাকারা: ১৪৪, মুসলিম ৩৯৭)

৪. সুতরা: সিজদার জায়গার একটু সামনে (কমপক্ষে আধা হাত উঁচু একটি লাঠি বা অন্য কিছু দিয়ে) সুতরা দেবে (হাকেম- ১/২৫২)। সুতরা ও মুসল্লীর দাঁড়ানোর মাঝখান দিয়ে সালাত চলাকালীন হাঁটা-চলা নিষিদ্ধ। বিশেষ করে নামাযীর সামনে দিয়ে কোন (সাবালিকা) নারী, গাধা বা কালো কুকুর যাতায়াত করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায় (মুসলিম: ৫১০)। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে। অতঃপর বিনম্র হয়ে খুশূ ও খুযূ-এর সাথে সালাতের জন্য দাঁড়াবে।

৫. দু'পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখার পরিমাণ: এ বিষয়ে সরাসরি কোন হাদীস খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মুসল্লি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াবে। কেউ কেউ দু'পায়ের মাঝে চার আঙুল পরিমাণ ফাঁকা রাখাকে সুন্নাত মনে করে। অথচ চার আঙুল ফাঁকা রাখার কোন কথা হাদীসে নেই।

৬. পাশের মুসল্লির পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ানো: জামাআতে দাঁড়ানোর সময় সাহাবাগণ পরস্পর একে অপরের পায়ের সাথে পা ও কাধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে মিশে মিশে দাঁড়াতেন। আনাস (রা) বলেন,

"আমাদের কেউ কেউ তার পাশের মুসল্লির কাধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিশিয়ে দাঁড়াত।" (বুখারী: ৭২৫, ইফা ৬৮৯)। সাহাবীগণ দু'জনের মাঝে কোন ফাঁকা রাখতেন না। জামায়াতে নামাযের ক্ষেত্রে দু'জন মুসল্লির মাঝে কোন ফাঁকা রাখা জায়েয- এমন কোন হাদীস নেই; বরং ফাকা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ফাকা থাকলে সেখানে শয়তান ঢুকে পড়ে। আপনার ডানে ও বামে শয়তান সাথে নিয়ে নামায পড়বেন- এ কেমন কথা! আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

"তোমরা তোমাদের কাতারে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়াও, একে অপরের নিকটবর্তী হও এবং ঘাড়গুলোকে সমানভাবে সোজা রেখে দাঁড়াও। সেই মহান সত্তার (আল্লাহর) কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি দেখতে পাই কাতারে কোথাও ফাঁকা থাকলে সেখানেই শয়তান ঢুকে পড়ে কালো ভেড়ার বাচ্চার আকৃতিতে।" (আবু দাউদ: ৬৬৬)

৭. কাতার সোজা করা: জামাআতে নামাযের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম কাতার সোজা করে দাঁড়াতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

"তোমরা কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াও, কেননা কাতার সোজা করা নামাযের পূর্ণতার অংশ।" (মুসলিম: ৪৩৩)।

ক. নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (স) মুসল্লিদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা কাতারগুলো সোজা কর।এ কথাটি তিনি ৩ বার বললেন, আল্লাহর কসম করে বলছি! তোমরা অবশ্যই কাতার সোজা করে নাও, নতুবা আল্লাহ তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন (আবু দাউদ)। অর্থাৎ কাতার বাকা রাখলে ঐ মুসল্লির অন্তর বাঁকা করে দেবেন।" (মুসলিম: ৪৩১) আর কাতার সোজা করার নির্দেশটি দেবেন ইমাম সাহেব; মুয়াযিন সাহেব নন।

খ. উমর (রা) সালাতে কাতার ঠিক হলো কি না তা দেখার জন্য একজন লোক নিয়োগ করতেন। কাতার সোজা হয়েছে- এ খবর না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা করতেন না।(তিরমিযী)

গ. কাতার সোজা না করলে উমর (রা) ও বেলাল (রা) ঐ মুসল্লির পায়ে আঘাত করতেন। (মিরআতুল মাফাতীহ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২) কাতার হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জন হওয়া আবশ্যক। তবে মহিলা মুসল্লি একজন হলেও তিনি পেছনে আলাদা কাতারে দাঁড়াবেন।

৮. সামনের কাতার আগে পূর্ণ করা: যারা আগে আসবেন তারা সামনের কাতারে এগিয়ে। বসবেন অন্যকে সামনের কাতারে যাওয়ার অনুরোধ না করে অধিক সওয়াব লাভের আশায় নিজেই সেই সুযোগ গ্রহণ করুন। আর মসজিদের গেটে বা দরজায় বা সিঁড়িতে বসে মুসল্লিদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। আর যারা পরে আসবেন, তারাও অন্যদের ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যাবেন না।

৯. ইকামাত: আযান ও ইকামাতের শব্দ একই। এ শব্দগুলো ইকামাতে দু'বার বলা যেমন জায়েয (শরহে মাআনীল আসার: ৭৬৪) তদ্রুপ বেজোড় সংখ্যায় একবার বলাও সহীহ (বুখারী ৬০৫-৬০৭)। তবে (আল্লাহু আকবার) এবং *কাদ কা-মাতিস্ সলাহ* দু'বার বলতে হবে। একাকী নামায এবং দ্বিতীয় জামাআতেও ইকামাত দেওয়া সুন্নাত। ইকামত শেষ হওয়ার পর ইমাম সাহেব ডানে-বামে তাকিয়ে কাতার সোজা করার নির্দেশ দেবেন। আর তার ভাষা হবে আদেশসূচক; অনুরোধের সুরে নয়। আমরা কাতার সোজা করি'- এভাবে বলবেন না; বরং বলবেন, কাতার সোজা করুন'- এরূপ নির্দেশ দেবেন। কারণ তিনি ইমাম, এখানে তিনি নেতা, হাদীসের মর্মও তা-ই। কোন কোন এলাকায় ইকামাতের শুরুতেই মুসল্লিরা না দাঁড়িয়ে তারা দাঁড়ান *হাইয়্যা আলাস্ সলা-হ* বলার পর। এমন কোন নিয়ম হাদীসে আসেনি; সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেও এমনটি প্রমাণিত নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, ইকামাতের শুরুতেই দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করা। কারণ বিলম্বে দাঁড়ানোর ফলে কাতার সোজা করা, পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ানো ও সামনের কাতার আগে পূর্ণ করা ইত্যাদি মৌলিক কাজগুলো সম্পাদনে বিশৃঙ্খলা হবার আশঙ্কা থাকে।

১০. নিয়ত: নিয়ত না হলে কোন ইবাদতই বিশুদ্ধ হয় না। নিয়ত শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা পোষণ করা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল যে সালাতই হোক বা যত রাকআতই হোক, মনে মনে এর নিয়ত করবে। আরবী বা বাংলায় মুখে এর নিয়ত উচ্চারণ করবে না। কেউ কেউ নাওয়াতু আন উসাল্লিয়া... পড়ে থাকেন- এটাও ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) সালাতের নিয়ত কখনো মুখে মুখে উচ্চারণ করেননি; নিয়ত মূলতঃ অন্তরের কাজ; মুখে উচ্চারণের বিষয় নয়। তাই শরী'আতের বিধান হলো মনে মনে নিয়ত করা। আর নিয়তের স্থান হলো কলব বা অন্তর, জিহ্বা নয়।

১১. তাকবীরে তাহরীমা: সালাতের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (স.) তার দু'হাত কখনো কাঁধ আবার কখনো কান বরাবর উঠাতেন (আবু দাউদ: ৭২৮)। রাসূলুল্লাহ (স) হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিয়েছেন (বুখারী: ৭৩৭, ইফা ৭০১)। তবে কানের লতি ছোয়ানো সুন্নাত নয়। হাত তোলার সময় আঙুলগুলো সোজা রাখবে এবং হাত কিবলামুখী করে রাখবে।

১২. হাত বাঁধা: রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নামাযে বুকের উপর হাত রাখতেন।

ক. তাঁর সাহাবী ওয়াইল বিন হুজুর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
"আমি নবী (স)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। (আমি দেখেছি) তিনি (স.) তার বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন।" (সহীহ ইবনু খুযাইমা, পৃষ্ঠা ২, আবু দাউদ: ৭৫৯, আলবানী)

খ. অপর এক সাহাবী সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন
"সালাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখার নির্দেশ দেওয়া হতো।" (বুখারী: ৭৪০, ইফা: ৭০৪) আরবীতে কাফফ' শব্দের অর্থ হলো, কজি পর্যন্ত হাত, আর 'যিরা' অর্থ হলো, হাতের আঙুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই পর্যন্ত পূর্ণ এক হাত বা বাহু। অতএব, উক্ত হাদীসের মর্ম ও নির্দেশ অনুযায়ী ডান হাতের আঙুলগুলো বাম কনুই'র কাছাকাছি থাকবে।(আবু দাউদ: ৭৫৯ আলবানী)।
কেউ কেউ বলেছেন, নাভির নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। তবে নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলো দুর্বল। (আলবানীর যঈফ আবু দাউদ- ৭৫৬, ৭৫৮) অতএব, সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে এর বিপরীতে দুর্বল হাদীস আমল করা জায়েয নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, নারীরা বুকে বাঁধবে আর পুরুষেরা বাঁধবে নাভির নিচে। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (স) যেখানে কোন পার্থক্য করেননি সেখানে আলেমগণ কিভাবে পার্থক্য করেন? স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হলো, এ হাদীসের নির্দেশ পুরুষ ও নারী সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সহীহ হাদীসের আলোকে প্রমাণিত যে, বুকের উপর হাত রাখা নারী-পুরুষ সকলের জন্যই সুন্নাত।

১৩. দৃষ্টি: দাঁড়ানো ও রুকু অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টি থাকত সিজদার স্থানে, আর বসার সময় তিনি ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলির দিকে নজর রাখতেন (সুনানে নাসাঈ: ১২৭৫, ১১৬০)। উল্লেখ্য, সালাত অবস্থায় বা নামাযে দু'আর সময় রাসূলুল্লাহ (স.) আকাশের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন, অন্যথায় তাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেওয়া হবে (মুসলিম: ৪২৮, ৪২৯) তাছাড়া সামনে ইমামের দিকে তাকানো বা চোখ বন্ধ করে রাখাও বৈধ নয়।

১৪. ছানা পড়া: অতঃপর ছানা পড়বে। ছানা'কে দু'আ ইসতিফতাহ্‌ও বলা হয়। ছানা কয়েক প্রকারের আছে। যে সালাতই হোক, এর শুরুতে শুধু ১ম রাকআতে যেকোন একটি ছানা পড়বে। একই সালাতে একাধিক ছানা পড়া সহীহ বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এখানে দু'টি ছানা দেওয়া হলো

প্রথম ছানা

“হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহখাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যেমন তুমি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমার পাপ ও ভুলত্রুটি হলে আমাকে এমনভাবে পবিত্র করো, যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।” (বুখারী: ৭৪৪, ইফা ৭০৮, মুসলিম: ৫৯৮)।

দ্বিতীয় ছানা: এ ছানাটি পড়াও সুন্নাত

“হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি।তোমার নাম মহিমান্বিত, তোমার সত্তা অতি উচ্চে আসীন। আর তুমি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।” (আবু দাউদ: ৭৭৬, তিরমিযী: ২৪৩)। কেউ কেউ সালাতের শুরুতে জায়নামাযের দু'আ হিসেবে ‘ইন্নী ওয়াজ্জাহ?' পড়ে। এটি ঠিক নয়। কারণ... ইন্নী ওয়াজ্জাহতু... একটি ছানা। আর ছানা পড়তে হয় তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর। (মুসলিম: ৭৭১)

১৫. আউযুবিল্লাহ পাঠ: অতঃপর চুপে চুপে পড়বে ‘বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' উল্লেখ্য, ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়বে কেবল সালাতের প্রথম রাকআতে।

১৬. বিসমিল্লাহ পাঠ: এরপর চুপে চুপে পড়বে, ‘পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতি রাক'আতেই বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা পড়তেন।

১৭. ফাতিহা পাঠ ও সূরা পড়ার নিয়ম: অতঃপর সূরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ সূরা পুরোটা পড়বে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছাড়া কোন সালাত আদায় হয় না। সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা রাসূলুল্লাহ (স.) প্রতি আয়াতের পর থেমে থেমে পড়তেন। যেমন , বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম অতঃপর থামতেন, আলহামদুলিল্লাহ হি রাব্বিল আলামিন আবার পড়তেন, আর রাহমানির রাহিম অতঃপর থামতেন, আবার পড়তেন, মালিকি ইয়াওমিদ্দিন তারপর থেমে আবার পড়তেন। এভাবে প্রতি আয়াত শেষে থেমে থেমে পূর্ণ সূরা পাঠ করতেন। (আবু দাউদ: ৪০০১, ইবনে মাজাহ: ৮৬৭) উল্লেখ্য, সালাতে আল্লাহ তাআলা বান্দার পঠিত সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের জবাব দিয়ে থাকেন (সুবহানাল্লাহ!)। (মুসলিম: ৩৯৫)

১৮. ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ: সশব্দে ও নিঃশব্দে পঠিত সকল সালাতে মুক্তাদিগণও ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়বে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামায হলো না’; (বুখারী: ৭৫৬, ইফা: ৭২০, আধুনিক: ৭১২)।

আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর এক মতানুসারে, ইমাম যখন সশব্দে কিরাআত পড়েন তখন মুক্তাদীগণ না পড়ে চুপ করে শুনবে। আর নিঃশব্দে পঠিত সালাতে মুক্তাদীরা অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়বে। এ মতটি হানাফী ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ পোষণ করেছেন, তাছাড়া ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা এবং শাইখ আলবানী (র.)ও এ মত গ্রহণ করেছেন।ইমাম আবদুল হাই লাখনভী (র.) তাঁর গ্রন্থে সেটা বর্ণনা করেছেন ।

বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে পড়া না পড়া উভয়েরই দলীল রয়েছে। তবে পড়ার পক্ষের দলীলগুলো বেশি শক্তিশালী। বিশিষ্ট সাহাবী জাবের (রা) বলেন,

"আমরা যোহর ও আসরের সালাতে প্রথম দু'রাকাআতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করতাম এবং শেষ দু'রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তাম।" (ইবনে মাজাহ: ৮৪৩)। তবে যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে জামা'আতে শরীক হয় তাহলে সে ঐ রাকাআত পেয়ে গেল।

১৯. আমীন বলা: সূরা ফাতিহার পর ইমাম ও মুক্তাদি সবাই আমীন বলবে। আমীন শব্দের অর্থ হলো 'হে আল্লাহ, কবুল কর। হাদীসে আছে, মুসল্লীগণ যখন আমীন বলে তখন ফেরেশতারা তাদের সাথে সাথে আমীন বলে। যখন উভয় গ্রুপের আমীন বলার আওয়াজ এক হয়ে যায় তখন এ মুসল্লীদের পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।(বুখারী: ৭৮০, ইফা ৭৪৪, আধুনিক ৭৩৬) আমীন চুপে চুপে ও সশব্দে পড়া যায়। চুপে চুপে বলার পক্ষে একটি হাদীস রয়েছে (দারা কুতনী: ১২৫৬); যদিও সনদ ও মতনে ত্রুটি থাকায় মুহাদ্দিসগণ এটাকে দুর্বল হাদীস বলেছেন। সশব্দে পঠিত কিরাআতবিশিষ্ট সালাতে রাসূলুল্লাহ (স.) ও সাবাহায়ে কেরাম জোরে আওয়াজ করে আমীন বলতেন। এ মর্মে বেশ কয়টি প্রমাণ রয়েছে:

ক. ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে *গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অয়ালাদ দোয়াল্লীন* পড়তে শুনেছি। অতঃপর তিনি নিজের স্বরকে লম্বা করে 'আমীন' বলেছেন।" (তিরমিযী: ২৪৮)

খ. অন্য এক হাদীসে এসেছে, ।

"সাহাবী ইবনু যুবায়ের (রা) আমীন' বলতেন এবং তাঁর পেছনের মুসল্লিরাও বলতেন। ফলে 'আমীন' বলার আওয়াজে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত।" (বুখারী, তাগলীকুত তালীক ২/৩১৮, হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী [র]) (তিরমিযি: ২৪৮, আবু দাউদ: ৯৩২, ইবনে মাজাহ: ৮৫৫, দারেমী: ১২৮৩)।

গ. মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) বলেন, "জোরে আমীন বলার হাদীসের সংখ্যাও বেশি এবং সেগুলো অধিকতর বিশুদ্ধ।' (আবকারুল মিনান, পৃষ্ঠা ১৮৯)। এ সুন্নাত অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ

(স)-এর যামানা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মক্কা মুকাররমার কাবা ঘর ও মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববীতে জোরে আওয়াজের সাথে আমীন বলার সুন্নাত আজো চালু রয়েছে। তবে ইমামের আমীন বলার সাথে মুক্তাদীগণ 'আমীন' বলবে; ইমামের আগে বলবে না।

২০. কিরাআত পাঠ: আমীন বলার পর একটু চুপ থেকে (সাকতা করে) কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবে।

ক. সকল প্রকার সালাতের প্রথম দু'রাকআতে ফাতিহা পাঠের পর অপর একটি সূরা পড়বে, অথবা কোন সূরার অংশবিশেষ পড়বে।
খ. আর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার পর রাসূলুল্লাহ (স.) কখনো সূরা মিলাতেন, আবার কখনো মিলাতেন না।
গ. প্রথম রাকআতে সূরা পাঠ তুলনামূলকভাবে একটু দীর্ঘায়িত করতেন।
ঘ. যোহর ও আসরের সালাতে ইমামের পেছনে প্রথম দু'রাকআতে মুক্তাদীগণও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা পড়তে পারে। আবার শুধু ফাতিহা পাঠ করেও ক্ষান্ত হতে পারে।
ঙ. একই রাকআতে সূরার অংশবিশেষ বা পূর্ণ সূরা বা একাধিক সূরা পাঠ করা জায়েয।

২১. সাকতা: সূরা পাঠ শেষ হলে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স.) সামান্য পরিমাণ সময় চুপ থেকে দম নিতেন। অতঃপর রুকুতে যেতেন এবং রুকূতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন।(আবু দাউদ: ৭৭৮)

২২. রুকুতে যাওয়ার পদ্ধতি: রুকুতে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স.) পুনরায় দু'হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠাতেন। রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় সাহাবায়ে কেরামও এভাবে দু'হাত উঠাতেন। (বুখারী: ৭৩৬-৭৩৮, ইফা ৭০০-৭০২, আধুনিক ৬৯২৬৯৪, মুসলিম: ৩৯১)

২৩. রুকুর পদ্ধতি: রুকুতে রাসূলুল্লাহ (স.) হাঁটুতে হাত রাখতেন এবং তাঁর পিঠ সোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত তাঁর পিঠটা মাটির সমান্তরালে এমন সোজা করে রাখতেন, যার উপর পানি রাখলেও ঐ পানি সমান উচ্চতায় স্থির হয়ে থাকবে।(ইবনে মাজাহ: ৮৭২)

২৪. রুকু অবস্থায় হাত রাখার নিয়ম: হাঁটুতে হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে

রাখবে।(আবূ দাউদ: ৭৩১)

২৫. রুকুর তাসবীহ: রুকুতে তিনি (ক) নিম্নোক্ত তাসবীহ তিন বা ততোধিক বার পাঠ করতেন, সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম 'আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।' (খ) তিনি কখনো কখনো রুকুতে এ দু'আও পড়তেন, *"সুবহানা যিল্ জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল 'আযমাতি"*
"হে দুর্দান্ত প্রতাপশালী, রাজত্ব, অহংকার ও বড়ত্বের মালিক আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।" (আবু দাউদ: ৮৭৩) যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় করে না রাসূলুল্লাহ (স.) ঐ ব্যক্তিকে সালাত চোর বলে আখ্যায়িত করেছেন। (ইবনু আবী শাইবা- ১/৮৯/২)

বুখারীতে আছে, বিশিষ্ট সাহাবী হুযাইফা (রা.) একবার দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তার সালাতে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করছে না। তখন তাকে তিনি বললেন, যদি তুমি এভাবে সালাত আদায় করতে থাক আর এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে সে মৃত্যু হবে মুহাম্মদ (স.)-এর তরীকার বাইরে। (বুখারী: ৩৮৯, ইফা ৩৮২, আধুনিক ৩৭৬) অপর এক হাদীসে এসেছে- রুকূ সিজদা ঠিকমতো আদায় না করলে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে।(বুখারী: ৭৯১, ইফা ৭৫৫, আধুনিক ৭৪৭)

২৬. রুকু থেকে উঠার নিয়ম: অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময়ও রাসূলুল্লাহ (স.) তাকবীরে তাহরীমার মতোই তাঁর দু'হাত কাঁধ (বা কান) বরাবর উঠাতেন। এ কাজকে আরবীতে 'রাফউল ইয়াদাইন' বলা হয়। তবে সিজদা করার সময় রাফউল ইয়াদাইন' করতেন না। (বুখারী: ৭৩৫, ইফা ৬৯৯, আধুনিক ৬৯১; মুসলিম: ৩৯০) রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর নামাযে 'রাফউল ইয়াদাইন' করতেন- এ মর্মে ৩৩টির মতো সহীহ হাদীস রয়েছে। তাছাড়াও ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সংকলিত 'জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন' গ্রন্থে এর পক্ষে সহীহ ও যঈফ মিলিয়ে মোট ১৯৮টি হাদীস জমা করেছেন।
উল্লেখ্য যে, যারা রাফউল ইয়াদাইন করে না তাদের পক্ষেও দলীল আছে। সেটি সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তবে এর সংখ্যা মাত্র একটি। আর দুর্বল হাদীস ও সহীহ আছার মিলিয়ে এর পক্ষে আরো ৪/৫টি বর্ণনা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে 'রাফউল ইয়াদাইনের পক্ষের হাদীসের সংখ্যা দুইশতেরও বেশি। এগুলোর শুদ্ধতাও বেশি। অতএব এই আমল করলে সাওয়াবও অনেক বেশি হবে, ইনশাআল্লাহ। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে এটাই আমার মাযহাব। অতএব, হানাফী হলেও এমন একটা সুন্নাত আমলের মধ্যে মাযহাবের কোন সমস্যা নেই। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আজীবন রাফউল ইয়াদাইন করেছেন (যাদুল মাআদ)। অতএব, বিষয়টি নিয়ে একে অপরকে

কটাক্ষ না করি, খড়গহস্ত না হই। বিশেষ করে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ 'রাফউল ইয়াদাইনে অভ্যস্ত নয় তারাও মনে দ্বিধা-সংকোচ না রেখে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মহব্বতে এ সুন্নাতটি আমল করা উচিত।

২৭. কাওমার সময়: রুকু থেকে উঠার নাম কাওমা। রুকুতে রাসূলুল্লাহ (স.) যে পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন রুকু থেকে উঠেও তিনি প্রায় সেই পরিমাণ বা তার কাছাকাছি সময় পরিপূর্ণ সোজা হয়ে (স্থিরভাবে) দাঁড়িয়ে থাকতেন। (বুখারী: ৭৯২, ইফা ৭৫৬, আধুনিক ৭৪৮)। অনেকেই রুকু থেকে সোজা হয়ে পরিপূর্ণভাবে দাঁড়ানোর আগেই সিজদায় চলে যান। এতে একটি ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়। এটি বহুল প্রচলিত একটি মারাত্মক ভুল। অথচ আনাস ইবনে মালেক (রা) একবার নবী (স.)-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাতে গিয়ে তিনি যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন তখন (এত দীর্ঘ সময়) দাঁড়িয়ে রইলেন যে, অন্যরা মনে করল তিনি (বোধহয় সিজদার কথা) ভুলেই গিয়েছেন। এভাবে ধীরস্থিরভাবে রাসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইমাম হয়ে বা একাকী সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি বলতেন, সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার কথা শুনেছেন।' (বুখারী ৭৮৯, ইফা ৭৫৩)

২৮. রুকু হতে উঠার পর দুআ

ক. রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমাম, মুক্তাদি ও একাকী সালাত আদায়কারী সকলেই বলতেন, রাব্বানা লাকাল হামদ , "হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা।" (বুখারী: ৭৪৫)।

খ. অথবা বলতেন, রব্বানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছীরান ত্বায়্যিবান মুবা-রাকান ফীহি "হে আমাদের রব! তোমারই জন্য অধিক বরকতময় ও উত্তম প্রশংসা।" (বুখারী: ৭৯৯, ইফা ৭৬৩, আধুনিক ৭৫৫) উপরোক্ত দু'আটির ব্যাপারে একবার রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমি দেখলাম এ দু'আ পাঠের সাওয়াব (এত বেশি যে, পাঠকের আমলনামায় তা) কে আগে লিখবে এ নিয়ে ৩০ জনের অধিক ফেরেশতা প্রতিযোগিতায় লেগে গেছে।(বুখারী: ৭৯৯, ইফা ৭৬৩, আধুনিক ৭৫৫)

গ. রাব্বানা লাকাল হামদ' বলার পর নবী (স) কখনো এ দু'আটিও পড়তেন *মিল'আস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল'আল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা, ও মিল'আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু*

ঘ. মাঝে মধ্যে এর সাথে আরও কিছু বৃদ্ধি করে বলতেন, *আহলাস সানা-য়ি ওয়াল মাজদি, আহাক্কু মা ক্বালাল 'আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্বাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'য়ু যাল-জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু*

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এ দুআগুলো পড়ার সময় পর্যন্ত দেরি করা কাওমার সময় বলে বিবেচিত হবে। এ দুআগুলো পাঠ করলে কাউমার (রুকূর পর স্থির হয়ে দাঁড়ানোর) হকও আদায় হয়ে যাবে।

২৯. সিজদায় যাওয়ার পদ্ধতি: রাসূলুল্লাহ (স.) সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে।(আবু দাউদ: ৮৪০, নাসাঈ: ১০৯৪, হাদীসটি সহীহ)। অন্য হাদীসে আছে, তিনি আগে দুই হাঁটু মাটিতে রাখতেন (আবু দাউদ: ৮৩৮, ৮৩৯)।

৩০. সিজদা করার পদ্ধতি: নবী করীম (স.) সিজদারত অবস্থায় হাতের তালু মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন (বুখারী: ৮২৮, ইফা ৭৯০, আধুনিক ৭৮২)। সাতটি অঙ্গের উপর ভর দিয়ে সিজদা করতেন (বুখারী: ৮১২, মুসলিম: ৪৯০)। যেমন-

(ক) কপাল ও নাক [তিনি (স.)] হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে নাককে কপালের অন্তর্ভুক্ত করেন) [বুখারী: ৮১২], ইফা ৭৭৫, আধুনিক ৭৬৭।

(খ) দুই হাত

(গ) দুই হাঁটু

(ঘ) দুই পায়ের আঙুলসমূহের অগ্রভাগ। কপালের মতো নাকও মাটিতে রাখতে হবে। তিনি (স.) হাতের আঙুলগুলো সোজা করে নরমভাবে কিবলামুখী করে রাখতেন। দুই পায়ের গোড়ালি একত্রে ভালোভাবে মিলিয়ে রাখতেন (সহীহ ইবনে খুযাইমা: ৬৫৪)। সে সময় রাসূল (স.)-এর মুখমণ্ডল তাঁর দুই হাতের মধ্যবর্তী স্থানে কাধ বা কান বরাবর রাখতেন এবং হাতের কজি থেকে কনুই পর্যন্ত তার বাহু যমীন থেকে উপরে উঠিয়ে রাখতেন। সাবধান! কুকুরের মতো কনুই পর্যন্ত হাত দুটো যমীনে বিছিয়ে দেবে না (বুখারী: ৮২২, আধুনিক ৭৭৬)।

তিনি দুই পায়ের আঙুলে ভর করে হাঁটু দাঁড় করিয়ে রাখতেন। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। সিজদা লম্বা হবে এবং পিঠ সোজা থাকবে। আল্লাহ ঐ বান্দার সালাতের দিকে তাকান না, যে ব্যক্তি তার সালাতে রুকু ও সিজদার মধ্যে নিজের মেরুদণ্ড সোজা করে না (আহমাদ- ২/৫২৫; তাবরানী; মুজামুল কবীর- ৮/৩৩৮)। রাসূলুল্লাহ (স.) পেট থেকে উরু এতটুকু পরিমাণ দূরে রাখতেন, যাতে উক্ত ফাঁকা অংশ দিয়ে একটি বকরির বাচ্চা বা ছাগল ছানা

আসা-যাওয়া করতে পারে (মুসলিম: ৪৯৬)। তাছাড়া দুই উরুর মাঝখানে একটু ফাঁকা থাকবে। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই একই পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মতো সিজদা করবে। মেয়েদের আলাদা পদ্ধতিতে সিজদা করার কোন কথা হাদীসে নেই। মেয়েদের কেউ কেউ হাত ও কনুই পর্যন্ত বাহু জমিনে বিছিয়ে বিছানার সাথে একেবারে মিশে গিয়ে সিজদা করে। অথচ এমনভাবে সিজদা করতে আল্লাহর রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন। সিজদা করার এ পদ্ধতিকে রাসূলুল্লাহ (স.) কুকুরের বসার সাথে তুলনা করেছেন। আনাস বিন মালেক (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,
“সিজদার সময় তোমাদের কেউই যেন দুই বাহু বিছিয়ে না দেয়, যেমনভাবে বিছিয়ে দেয় কুকুর।” (বুখারী: ৮২২, ইফা ৭৮৪, আধুনিক ৭৭৬)

৩১. সিজদার তাসবীহ: সিজদায় রাসূল (স) নিমের তাসবীহটি পড়েছেন, *সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা* - “আমি আমার সুউচ্চ মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।”

৩২. সিজদার দু'আ: সিজদা অবস্থায় বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। তাই রাসূলুল্লাহ (স.) সে সময় বেশি বেশি দু'আ করতে বলেছেন (মুসলিম: ৪৮২)। কেননা এটি দু'আর উত্তম মুহূর্ত তা ফরয বা নফল যে কোন সালাতেই হোক না কেন। সিজদায় আমাদের রাসূলুল্লাহ (স.) বহু ধরনের দু'আ করতেন। তন্মধ্যে নিয়ে একটি দু'আ উল্লেখ করা হলো:

আল্লা-হুম্মাগফির লী যাম্বী কুল্লাহু; দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউয়ালাহু ওয়া 'আখিরাহু, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু
“হে আল্লাহ! আমার সব গোনাহ তুমি ক্ষমা করে দাও, হোক তা ছোট বা বড়, আগের বা পরের, প্রকাশ্য বা গোপন ।” (মুসলিম: ৪৮৩)। আবার কোন কোন তাসবীহ রাসূলুল্লাহ (স.) রুকু ও সিজদাহ উভয় অবস্থাতেই পড়তেন, আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স.) রুকু ও সিজদায় পড়তেন,

সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ
“আমাদের এবং সমস্ত ফেরেশতা ও জিবরীলের প্রতিপালক অত্যন্ত পূত-পবিত্র।” (মুসলিম: ৪৮৭) রাসূলুল্লাহ (স.) আরো বলেন, রুকুতে আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা আর সিজদাতে অধিক পরিমাণে দুআ কর (মুসলিম: ৪৭৯)। উল্লেখ্য, রুকু ও সিজদা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত নিষেধ। তবে, কুরআনে বর্ণিত দুআগুলো সিজদায় দু'আ হিসেবে পড়া যেতে পারে। কোন কোন ফকীহ সিজদায় আরবী ছাড়া অন্যকোন ভাষায় দুআ না করাই শ্রেয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

৩৩. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে সময়ের পরিমাণ: সিজদায় যে পরিমাণ সময় ব্যয় করবে এখানেও প্রায় সে পরিমাণ সময় লম্বা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রুকু, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর পরবর্তী কিয়ামের সময়ের পরিমাণ প্রায় সমান সমান বা তার কাছাকাছি ছিল। (বুখারী: ৭৯২, ইফা ৭৫৬, মুসলিম: ৪৭১)

৩৪. দু' সিজদার মাঝখানে যে দুআ পড়া সুন্নাত: দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ের বৈঠকে আল্লাহর রাসূল (স) নিম্নবর্ণিত দুআগুলো পড়তেন,

আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজবুরনী, ওয়া'আফিনি, ওয়ারযুক্বনী, ওয়ারফা'নী

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ ও নিরাপদে রাখ এবং আমাকে রিযক দান কর।" (আবু দাউদ: ৮৫০)। দু' সিজদার মাঝখানে স্থিরভাবে বসার ক্ষেত্রে অনেকে তাড়াহুড়া করেন। ইমাম সাহেব তাকবীর বলার আগেই কেউ কেউ দ্বিতীয় সিজদার জন্য ঝুঁকে পড়েন, এতে ওয়াজিব লঙ্ঘিত হয়ে যায়। উক্ত দুআগুলো পড়ার অভ্যাস করলে স্থিরভাবে বসার হকও আদায় হয়ে যাবে।

৩৫. দ্বিতীয় সিজদা: 'আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং প্রথম সিজদার ন্যায় তাসবীহ ও দুআ পড়বে। (বুখারী: ৮২৫, ইফা ৭৮৭, আধুনিক: ৭৭৯)

৩৬. জলসায়ে ইসতিরাহা: দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বক্ষণে রাসূলুল্লাহ (স.) একটু সময় স্থির হয়ে বসতেন (বুখারী: ৮২৩, আধুনিক ৭৭৭)। এ বৈঠককে 'জলসায়ে ইসতিরাহা' বা আরামে বসা বলা হয়।

৩৭. সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর নিয়ম: আল্লাহু আকবার বলে প্রথমে হাত পরে হাঁটু উঠাবে অথবা, মাটিতে হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। উভয়ই জায়েয।(আবু দাউদ: ৮৪০)

৩৮. দ্বিতীয় রাকআত এবং পরবর্তী রাকআতের পদ্ধতি: প্রথম রাকআত ছাড়া পরবর্তী কোন রাকআতে আর ছানা পড়তে হয় না এবং আউযুবিল্লাহ পড়ারও দরকার নেই। তবে প্রতি রাকআতেই সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব। আর বাকি সব। নিয়ম-কানুন প্রথম রাকআতের মতোই। তবে প্রথম রাকআতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকআতের কিরাআত পড়া ছোট করা ভালো। (মুসলিম: ৪৫১)

৩৯. প্রথম বৈঠকের পদ্ধতি: দুই রাকআত নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে পুরোপুরি সোজা হয়ে বসতেন। সে সময় বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে (পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে) বসতেন। বসা অবস্থায় দুই হাত উরুতে রাখতেন (নাসাঈ: ১২৬৪; তিরমিযী: ২৯২)। এ কায়দার বৈঠককে ‘ইফতিরাশ’ বলা হয়।

৪০. দ্বিতীয় বৈঠকের পদ্ধতি: তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপর ভর করে বসবে। তখন ডান পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে খাড়া করে রাখবে। এ পদ্ধতির বৈঠককে তাওয়াররুক' বলা হয়।(দেখুন, বুখারী: ৮২৮, ইফা ৭৯০, আধুনিক ৭৮২)।

৪১. বসা অবস্থায় আঙুল রাখার পদ্ধতি: বাম হাত বাম উরুর উপর রেখে আঙুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন আর ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে ডান হাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা এ দুটি আঙুল গুটিয়ে এনে বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙুল দুটির মাথা একত্র করে গোলাকার বৃত্তের মতো করে ধরে রাখবেন এবং শাহাদাত আঙুলটি তখন মৃদুভাবে নাড়াবেন। আর মুসল্লীর এ কাজটি শয়তানের জন্য খুবই কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, আঙুলটি ইশারা করেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে ফেলবেন না; বরং সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত শাহাদাত আঙুলটি খাড়া করে মৃদুভাবে নেড়ে দু'আ করতে থাকবেন। অর্থাৎ, দুআগুলোর অর্থের দিকে খেয়াল রাখবেন এবং আল্লাহুম্মা’ শব্দ উচ্চারণ করার সময়ও আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করবেন।

হাদীসে এসেছে, (....আরবী)

৪২. বসা অবস্থায় যা পড়তে হয়: যদি প্রথম বৈঠক হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকআতের পর শুধু ‘আত্তাহিয়্যাতু পড়বে ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহ’ পর্যন্ত। আর যদি শেষ বৈঠক হয় তাহলে প্রথমে। আত্তাহিয়্যাতু, এরপর দরূদ, তারপর দু'আ মাছুরা এবং সম্ভব হলে একাধিক দু'আ মাছুরা পড়বে। রাসূলুল্লাহ (স) এভাবেই করেছেন

ক. প্রথমে নিম্নবর্ণিত আত্তাহিয়্যাতু পড়বে-

আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সালাওয়া-তু ওয়াত্তায়্যিবা-তু আস্‌সালা-মু ‘আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আস্‌সালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লা-হিস সা-লেহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু

"যাবতীয় অভিবাদন, সর্বপ্রকার সালাত ও পবিত্রতা কেবল আল্লাহ তাআলারই প্রাপ্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন মাবুদ নেই এবং এ কথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।" (বুখারী: ৮৩১, ইফা ৭৯৩, আধুনিক ৭৮৫)

খ. অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) এ দরূদটি পড়তেন, যাকে দরূদে ইবরাহীমও বলা হয়ে থাকে।

আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিউওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ

"হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করো, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল করো, যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" (বুখারী: ৩৩৭০)

গ. সবশেষে পড়বে দু'আ মাছুরা (নিম্নবর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক)

আল্লা-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরা। ওয়ালা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা। ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব, তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (বুখারী: ৮৩৪, ইফা ৭৯৫, আধুনিক ৭৮৭)

আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাবরি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি, ওয়া আ'উযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-ত। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরামি

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।আরো আশ্রয় চাই দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। আরো আশ্রয় চাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে।" (বুখারী: ১৩৭৭)

উল্লেখ্য, ১০টিরও অধিক দু'আ মাছুরা রয়েছে, যা বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) সালাতে পাঠ করতেন।

৪৩, সালাম ফেরানো: অতঃপর ডানে ও বামে *আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ* বলে সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবে। সালাম দুদিকে ফিরালেও মূলতঃ এটাকে একটি কাজ ধরা হয়। সেজন্য একদল ফকীহর মতে, সবচেয়ে সহীহ পদ্ধতি হলো, ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় সালাম ফেরানো শেষ হলে মুক্তাদিরা প্রথম সালাম শুরু করবে। অতঃপর দ্বিতীয় সালাম ফেরাবে। মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববীসহ সে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লিরা এভাবেই সালাম ফেরায়।

৪৪. ইমামের ইকতেদা করা: কোন অবস্থাতেই রুকু, সিজদা, উঠা বা বসাসহ কোন কাজই ইমামের আগে আগে করা জায়েয নেই। এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এমনকি ইমামের সাথে সাথেও করা ঠিক নয়; বরং সঠিক হলো ইমামের তাকবীর প্রদানের আওয়াজ শেষ হওয়ার পরই তা করা।

৪৫. ইমামের পেছনে মুক্তাদি যা যা পড়বে: ইমাম যখন 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে মুক্তাদি তখন বলবে 'রব্বানা লাকাল হামদ'। এছাড়া আল্লাহু আকবার', তাসবীহ, তাশাহহুদ, দুআ-দরূদ ও সূরা ফাতিহা ইমাম যেমন পড়বে, মুক্তাদি হুবহু তাই পড়বে। বিশেষ করে নীরবে পঠিত সালাতে মুক্তাদিদের সূরা ফাতিহা পড়াকে অধিকাংশ আলেম ফরয বলেছেন। ইচ্ছা করলে মুক্তাদি ইমামের পেছনে ফাতিহা পরবর্তী অন্য সূরাও পড়তে পারে, বা পড়লেও কোন দোষ নেই।

৪৬. লুকমা দেওয়া: জামাআতে নামাযে ইমাম ভুল করলে পেছন থেকে পুরুষ মুসল্লীরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, আল্লাহু আকবার' বলবে না। আল্লাহু আকবার বলে লুকমা দেওয়ার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। মহিলা মুসল্লীরা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে মেরে তালি দিয়ে আওয়াজ করবে (বুখারী: ১২০৩ ও মুসলিম: ৪২২) নারীরা মুখে কিছুই বলবে না।

৪৭. সহু সিজদা: ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা ওয়াজিব বা রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে অথবা কোন ওয়াজিব বা রুকন অতিরিক্ত হয়ে গেলে সহু সিজদা দিতে হয়। প্রচলিত নিয়মে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে একবার সালাম ফিরিয়ে দু'টি সহু সিজদা দেয়া হয়। এরপর আবার তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ মাছুরা পড়ে

ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে এ মর্মে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না।

সহু সিজদার বিশুদ্ধ পদ্ধতি: শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ মাছুরা পড়া শেষ হলে আল্লাহু আকবার বলে দুটি সিজদা করবে। অতঃপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে। এটিই হলো বিশুদ্ধ পদ্ধতি।দেখুন বুখারী: ১২৩০।

৪৮. মুসল্লীদের দিকে ইমামের ঘুরে বসা: জামাআতে নামাযের সালাম ফেরানোর পর রাসূলুল্লাহ (স.) ইমাম অবস্থায় কিবলার দিক থেকে ঘুরে মুক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। (বুখারী: ৮৪৫, ইফা: ৮০৫, আধুনিক: ৭৯৭)।

৪৯. ফরয সালাতের পর পঠিতব্য দু'আ ও যিকর: ফরয সালাতের সালাম শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) অনেক দু'আ ও যিকর করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু যিকর উল্লেখ করা হলো:

ক. তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন।
খ. অতঃপর এ দু'আটি পড়তেন,
আল্লা-হুম্মা আনতাস্ সালা-মু ওয়া মিনকাস্ সালা-মু তাবা-রক্তা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম

"হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার হতেই শান্তি উৎসারিত হয়।তুমি বরকতময় হে। মহান ও সম্মানের অধিকারী।" (মুসলিম: ৪৯১)

গ. নবী (স.) প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে এ দু'আটিও পড়তেন,

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু
"এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। মহাবিশ্বের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ, তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ করেছ, তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর তোমার নিকট (সৎ কাজ ছাড়া) কোন ধনবানের ধন তোমার আযাবের মোকাবিলায় কোন উপকারে আসে না।"
(বুখারী: ৬৩৩০, মুসলিম: ৫৯৩)

ঘ. তিন তাসবীহ: নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার পাঠ করার পর নিম্ন বর্ণিত দুআটি ১ বার পড়ে মোট ১০০ বার পূর্ণ করবে তার সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।(মুসলিম: ৫৯৭)

লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর।
“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই।সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা শুধু তারই। আর তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

ঙ. আয়াতুল কুরসী পাঠ: নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিসই জান্নাতে পৌছতে বাধা দিতে পারবে না। (নাসাঈ: ১০০, তাবরানী: ৭৫৩২)
চ. তারপর ফজর ও মাগরিব বাদ পড়বে সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা ফালাক ৩ বার, সূরা নাস ৩ বার। অন্যান্য ফরয সালাতের শেষে এ ৩টি সূরা পড়বে ১ বার করে।(আবু দাউদ: ১৫২৩) এছাড়াও যদি কেউ অন্য কোন যিকির-আযকার করতে চান তাহলে তা একাকী করতে পারেন। তাছাড়া তাসবীহ আঙুলে গুণে পড়া সুন্নাত। উল্লেখ্য, ফরয সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) জামা'আতবদ্ধভাবে কখনও দুআ করেননি। মক্কা, মদীনা ও আরাফাতের সর্ববৃহৎ জমায়েতেও এ ধরনের প্রচলন নেই। মদীনা শরীফের উলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতির মুনাজাতকে বিদআত বলেছেন। আমাদের কাছে ভালো মনে হলেও নবী (সা.) - এর সুন্নাতের বাইরে অতিরিক্ত কোন কিছু যোগ করা জায়েয নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্তব্য হলো, নামাযের মধ্যে যেসব তাকবীর, তিলাওয়াত, তাসবীহ ও দু'আ পাঠ করা হয় সেসবের অর্থ ও মর্ম বুঝে সালাত আদায় করা।তাহলে আমরা অনুধাবন করতে পারব যে, নামাযের মধ্যে কত হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় দুআ রয়েছে। শেষ বৈঠকের দুআয়ে মাছুরা’য় তো অনেক দু'আর সার-কথাই বলা হয়। জুমুআর খুতবার শেষ অংশের পুরোটাই দুআ, যাতে মুসল্লিগণ আমিন! আমিন!... বলে শরীক হতে পারেন। এর ফলে নামায শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রয়োজনই বোধ হবে না আর তা সহীহ তরীকাও নয়। যে সকল ইমাম সাহেব এসব বিশুদ্ধ কথা জানার পরও ফাসাদ সৃষ্টির ভয়ে ফরয সালাত শেষে নিয়মিত সম্মিলিত মোনাজাত করেন তাদের কর্তব্য হলো, নেক নিয়তে দরদি ভাষায় মুসল্লিদেরকে বিশুদ্ধ পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া। কেননা, সালাম ফেরানোর পরপরই মোনাজাত ধরার কারণে উল্লেখিত মাসনূন দু'আ ও তাসবীহগুলো প্রতিনিয়তই বাদ পড়ে যাচ্ছে ।

নামাজের অংশ সমূহের গুরুত্ব ও ফজিলত:

রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ ইসলামের অন্যান্য সব ইবাদত পৃথিবীর জমিনে ফরয হয়েছে।আর নামায ফরয হয়েছে আসমানের ওপর । শুধু তাই নয়, নামায আরশের পাশে স্বয়ংরাব্বুল আলামীনের উপস্থিতিতে ফরয হয়েছে। এজন্য নামাযের প্রতি যে ধরণেরগুরুত্বারোপ করা হয়েছে অন্যান্য ইবাদাতের ব্যাপারে এ ধরণের গুরুত্বের কথার উল্লেখনেই। তেমনি কুরআন-হাদীসে নামাযের কথা যেভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, অন্যান্যইবাদাতের বেলায় এমনটি বলা হয়নি।

তাকবীরে তাহরীমার গুরুত্ব ও ফযীলত: নামাযে আল্লাহু আকবার বলা পৃথিবী এবংপৃথিবীর সকল বস্ত থেকে উত্তম। ২. প্রত্যেক জিনিসের একটা মূল মর্ম থাকে, ঈমানেরমুলমর্ম হচ্ছে নামায আর নামাযের মূলমর্ম হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা। ৩. যখন নামাধীআল্লাহু আকবার বলে, তখন আসমান-যমীনের সব কিছুই তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।৪. হাদীস শরীফে আছে, তাকবীরে তাহরীমা বা ইমামের সাথে সাথে তাকবীর বলাহাজারো উট সদকা করার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ তার সওয়াব এক হাজার উট আল্লাহররাস্তায় সদকা করার চেয়ে বেশি হয়।

কিরাতের গুরুত্ব ও ফযীলত:

১. হযরত আলী রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন শরীফের যে কোন একটি হরফ পড়েবা শ্রবণ করে, সে দশটি সওয়াব পায়। তার দশটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। জান্নাতেতার মর্যাদা দশ ধাপ এগিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি নামাযে বসাবস্থায় কুরআন পড়ে,প্রতিটি হরফের বদলে সে ৫০টি করে সওয়াব, ৫০টি করে গুনাহ মাফ এবং জান্নাতে৫০ ধাপ করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআনপড়ে, সে প্রতি হরফের পরিবর্তে একশ একশ করে সওয়াব লাভ করে, একশটি করেতার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এবং জান্নাতে তার মর্যাদা একশ ধাপ করে এগিয়ে যায়।

২. যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইমামের সূরা ফাতিহাশ্রবণ করে সে এ ব্যক্তির মত যে শুরু থেকে জিহাদে শরীক হয়ে একেবারে শত্রু দেশজয় করে এসেছে। তথা সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদ করার সওয়াব পাবে । আরযে ব্যক্তি সুরা ফাতিহার শেষের দিকে এসে শরীক হয়। সে এ ব্যক্তির মত যে জিহাদেরঅংশ গ্রহণ করেনি কিন্তু বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের সময়ে এসে উপস্থিতহল। পার্থক্যটা নিচের ঘটনা থেকে স্পষ্ট আকারে ফুটে উঠবে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা কে একটিবাহিনীর সাথে জিহাদে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহিনীর সবাই জিহাদে

চলে গেলেন,কিন্তু তিনি এই ভয়ে জিহাদে যাননি, যে হয়তো আমি শহীদ হয়ে যাব আর কখনোরাসূলের পিছনে জুমা পড়ার সুযোগ পাব না। অর্থাৎ শুধু রাসূলের পিছনে জুমার নামাযপড়ার আশায় জিহাদে যাননি। জুমার পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবিষয়টি জানতে পারলেন, তখন জিহাদে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন- তিনিধারণাটাকে দ্বিতীয়ববার ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, আমি এখনই যাব। রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আব্দুল্লাহ! বাহিনীর অন্যান্য সদস্য এবংতোমার মাঝে পাঁচ শত বছরের পার্থক্য হয়ে গেল। অর্থাৎ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তোমারএবং তাদের মাঝে এত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হল। (মিশকাত)

কিয়াম বা নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার ফযীলত:

১. বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মাথার ওপরসওয়াবের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে।২. যখন বান্দা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন আসমানের সব দরজা তার জন্য খুলেদেওয়া হয়। তার এবং আল্লাহর মাঝে যত রূহানী পর্দা আছে সব সরিয়ে ফেলা হয়।৩. নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালে মৃত্যু যন্ত্রণা এবং কঠোরতা দূরিভূত হয়ে যায়।৪. নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সহজে পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার বড় একটাউপায়।

রুকুর গুরুত্ব ও ফযীলত:

১. বান্দা যখন রুকু করে, তখন নিজের শরীরের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ সদকাহ করারসওয়াব পায়।২. বান্দা যখন রুকুর তাসবীহ বলে, তখন সমস্ত আসমানী কিতাব তেলাওয়াত করারসওয়াব পায়।৩. বান্দা যখন রুকু থেকে উঠে, তখন তাকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ রহমতের দৃষ্টিতেতাকান। (শরহে আরবায়িনা নববিয়্যাহ)

সিজদার গুরুত্ব ও ফযীলত:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সিজদা করার সময় বান্দাআল্লাহর যতটা নিকটবর্তী হয়, এতটা নৈকট্য অন্য কোন ইবাদতে অর্জিত হয় না।সুতরাং তোমরা সিজদার মধ্যে বেশি বেশি দোয়া কর। (মুসলিম)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি তোমরা জান্নাতে আমারসাথে থাকতে চাও, তাহলে বেশি পরিমাণে সিজদা কর। (মুসলিম শরীফ)

৩. আল্লাহর কাছে বান্দার সবচেয়ে প্রিয় অবস্থা হলো, সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে এবংতার চেহারা আল্লাহর সামনে মাটিতে পড়ে থাকবে। (তারগীব)

৪. মানুষ যখন সিজদা করে, তখন শয়তান কেঁদে কেঁদে সেখান থেকে পালিয়ে যায়এবং বলে আফসোস! মানুষের ওপর সিজদা করার হুকুম হল আর অমনি তারা সিজদাকরে জান্নাত কিনে নিল। অথচ আমার ওপর যখন সিজদা করার হুকুম হয়েছিল, আমিতা অমান্য করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেলাম।

৫. যখন নামাধী সিজদা করে, তখন সে সমস্ত জ্বীনজাতি এবং মানবজাতির সংখ্যারসমপরিমাণ সওয়াব পায়, আর যখন সিজদার তাসবীহ বলে, তখন একটা দাস মুক্তকরার সওয়াব পায়। (শরহে আরবায়িনা নববিয়্যাহ)

৬. মাদান বিন তালহা রা. বলেন, আমার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর গোলাম হযরত চাওবান রা. এর সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম,আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলুন যেটা করলে আমি কোন কষ্ট ছাড়া জান্নাতেপ্রবেশ করতে পারব। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেওকোন উত্তর দিলেন না। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, এসম্পর্কে আমি রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশি পরিমাণসিজদা করতে থাক। কেননা প্রত্যেক সিজদার বিনিময়ে আল্লাহ্একটি করে মর্যাদাবাড়িয়ে দেন এবং একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন। (মুসলিম শরীফ)

তাশাহুদের গুরুত্ব ও ফযীলত:

যখন নামাযী তাশাহুদ পড়ার জন্য বসে, তখন সে ধৈর্যধারণকারীদের সওয়াব পায়।অর্থাৎ হযরত আইয়ুব আ. হযরত ইয়াকুব আ. হযরত ইয়াহইয়া আ. প্রমুখের মত বড়বড় ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যক্তিত্বদের অনুরূপ সওয়াব অর্জন করে। এটাআল্লাহরই ধর্ম। তিনি যাকে যতটুকু চান সওয়াব দিতে পারেন। (সূরা বাকারা, আয়াত:১০৫)

দুরূদ শরীফের গুরুত্ব ও ফযীলত:

দরূদ শরীফ মানে হচ্ছে আল্লাহর দরবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরজন্য এমন রহমতের দোয়া করা যা উভয় জাহানোর জন্য কল্যাণকর হয়। নিম্মেকিঞ্চিত আলোচনা করা হল।উলামায়ে কেরাম লিখেন, জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরয। যে রকমভাবেপুরো জাবনে একবার নবুয়তের সাক্ষ্য প্রদান করা ফরয।

২. কাজী আবু বকর বলেন, আল্লাহ তায়ালা মুমিন বান্দার ওপর রাসূলের ওপর দুরূদপড়াকে ফরয করেছেন। তবে তার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি। পবিত্র কুরআনেবাণী- হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ওপর দরূদ এবং সালাম প্রেরণ কর। (সূরাআহযাব, আয়াত: ৫৬)

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, নামাযের শেষ বৈঠকে দুরুদ শরীফ পড়া ফরয।

৪. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়া সুন্নত। কোনমজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম কয়েকবার উচ্চারিত হলেএকবার দুরূদ পড়া ওয়াজিব। না পড়লে গুনাহগার হবে। তবে প্রতিবার দরূদ পাঠকরা মুস্তাহাব এবং অনেকে সওয়াব অর্জিত হয়।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একবার দরূদ পাঠকরবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দশবার রহম করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করেদিবেন এবং দশধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। (নাসায়ী শরীফ)

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন এ ব্যক্তিআমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার ওপর সর্বাধিক দরূদ প্রেরণ করবে বাআমার প্রতি সর্বাধিক দুরূদ প্রেরণকারী ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নৈকট্যলাভ করবে। (তিরমিযী শরীফ)

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ এমন কতিপয়ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যাদের কাজ হল তারা পৃথিবীতে বিচরণ করবে এবং আমারপ্রতি উম্মতের পক্ষ থেকে দুরূদ-সালাম পাঠিয়ে দিবে। (নাসায়ী শরীফ)

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠকরে, তার জন্য আমার সুপারিশ অনিবার্ধ হয়ে পড়ে । (মুসনাদে আহমদ)৯. হযরত উমর রা. বলেন, দোয়া আসমান এবং জমীনের মাঝখানে থেমে থাকে,একদম ওপরে ওঠে না। যতক্ষণ না তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরওপর দরূদ পাঠ কর। (তিরমিযী শরীফ)

সালাম ফিরানোর গুরুত্ব ও ফযীলত: নামাযী যখন নামায থেকে ফারেগ হতে সালামফেরায়। তখন তার বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতের আটটি দরজার সবকটি খুলে দেন।যাতে নামাধী নিজ ইচ্ছামত প্রবেশ করার অধিকার লাভ করে। (মাজালিসে সুনিয়া)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পরে আমল সমূহ:

ফজরের নামাজের পর: ফজরের পরে নির্দিষ্ট কোনো সূরা পাঠের কথা স্পষ্টভাবে কোনো হাদিসে নেই। তবে হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ؛ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে পড়ে। তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে। তারপর দুই রাকাত নামায পড়ে। সেই ব্যক্তির একটি হজ ও একটি উমরার সাওয়াব লাভ হয়। পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ। (তিরমযি ৫৮৬)

আর কোরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম যিকির এবং সূরা ইয়াসিন কোরআনের রূহ। সুতরাং দিনের শুরুটা যদি সূরা ইয়াসিন দিয়ে করা হয় তাহলে তা অবশ্যই বরকতপূর্ণ হবে। এজন্য বিশিষ্ট তাবিঈ ইয়াহইয়া ইবন কাসীর রহ বলেন,

من قرأ يس إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي ، ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح .قال :وأنبأنا مَن جرَّبَ ذلك

যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে-স্বস্তিতে থাকবে। যে সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। (বর্ণনাকারী ইবন যুরাইস, ফাযায়েলুল কুরআন, বর্ণনা নং ২১৮ পৃষ্ঠা ১০১)

জোহরের নামাযের পর: জোহরের পরেও নির্দিষ্ট কোনো সূরা পাঠের কথা হাদিসে নেই। তবে যেহেতু সূরা ফাতহ কোরআনের একটি ফজিলতময় সূরা, তাই এটি তেলাওয়াত করতে পারেন। এই সুরার ফজিলত সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর রাযি.-কে বলেছেন,

لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَرَأَ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا

আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে সূর্যালোকিত সকল স্থান হতে উত্তম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করলেন, **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا** 'নিশ্চয় আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।' (বুখারি ৪১৭৭)

আসরের নামাযের পর: আসরের পরেও নির্দিষ্ট কোনো সূরা পাঠের কথা হাদিসে নেই। তবে সূরা নাবা'র ফজিলত সম্পর্কে একটি দুর্বল হাদিসে এসেছে,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَرْدَ الشَّرَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি সূরা নাবা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন ঠাণ্ডা পানীয় দ্বারা তৃপ্ত করবেন। (তাফসিরে কাশশাফ ৬/৩০৩)

মাগরিবের নামজের পর: মাগরিবের পরে বা রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ সম্পর্কে বিভিন্ন তাফসিরের কিতাবে অন্তিম রোগশয্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন এসেছে, ইবন কাসীর ইবন আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন ওসমান রাযি. তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ যে কথোপকথন হয় তা নিম্নরুপ:

— হযরত ওসমান: **مَا تَشْتَكِي؟** আপনার অসুখটা কি?

—হযরত ইবনে মাসউদ: **ذُنُوبِي** আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

— হযরত ওসমান: **فَمَا تَشْتَهِي؟** আপনার বাসনা কি?

—হযরত ইবনে মাসউদ: **رَحْمَةَ رَبِّي** আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

— হযরত ওসমান: أَلَا آمُرُ لَكَ بِطَبِيبٍ؟ আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

—হযরত ইবনে মাসউদ: الطَّبِيبُ أَمْرَضَنِي চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

— হযরত ওসমান: أَلَا آمُرُ لَكَ بِعَطَاءٍ؟ আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

—হযরত ইবনে মাসউদ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ এর কোনো প্রয়োজন নেই।

— হযরত ওসমান:يَكُونُ لِبَنَاتِكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

—হযরত ইবনে মাসউদ: أَتَخْشَى عَلَى بَنَاتِي الْفَقْرَ؟ إِنِّي أَمَرْتُ بَنَاتِي يَقْرَأْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র ও উপবাসে পতিত হবে। আমি তো আমার কন্যাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করে। এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস করবে না। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৮/১০৬ সাফয়াতুত তাফাসীর ৩/৩০৪ ইবন কাসীর ৪/২৮১ তারিখে দামিশক ৩৬/৪৪৪ বাইহাকি ৪/১১৯

ইশার নামাযের পর: ইশার পরে বা রাতে সূরা মুলক পাঠ সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

من قَرَأَ)تبَارك الَّذِي بِيَدِهِ الْملك (كل لَيْلَة مَنعه الله بهَا من عَذَاب الْقَبْر ، وَكُنَّا فِي عهد رَسُول الله ﷺ نسميها الْمَانِعَة ، وَإِنَّهَا فِي كتاب الله سُورَة من قَرَأَ بهَا فِي كل لَيْلَة فقد أَكثر وأطاب

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুলকু.. পাঠ করবে, আল্লাহ্ তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূরাটিকে মানেআ’ বা বাধাদানকারী সূরা বলে আখ্যা দিতাম। এটি আল্লাহ তাআলার কিতাবের মাঝে এমন একটি সূরা, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে পাঠ করবে সে অধিক ও উৎকৃষ্ট আমল করবে। (নাসাঈ ১০৫৪৭)

জাবির রাযি. বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الم تَنْزِيلُ ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তেলাওয়াত করা ব্যতিরেকে ঘুমাতেন না। (তিরমিযি ২৮৯২)

মুমিনের বেঁচে থাকার স্পন্দন নামাজ :

নামাজ প্রতিক্ষণের সুস্থির অনুভব-উপলব্ধি, তিলাওয়াত-তাসবিহ, রুকু-সিজদার জন্যযে তৃষ্ত্া তৈরি করে, মৃত্যুর পরও তা বাকি থেকে যায়। সালাতের ব্যবহারিক ও বাহ্যিকদিকগুলো স্বল্পসময়ে আয়ত্তে আনা যেতে পারে, তবে অভ্যন্তরীণ উন্নতির ক্রমধারা যাউপলব্ধি ও সূক্ষ অনুভূতির জন্ম দেয়, তা আমৃত্যু শাণিত করতে হয়। তাই সালাতপ্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত শিক্ষার ও অনুশীলনের বিষয়টিও অন্তহীন।শাণিত ও শাশ্বত সালাত কেবল সালাতই নয়, তা মুমিনের বেচে থাকার হৃৎস্পন্দনওবটে। আত্মার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে এবং প্রকৃত আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলোআল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। সেই মহান অস্তিত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায়রাখা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিত সালাত আদায় করাএবং স্বীয় সালাতের পবিত্র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করা। এভাবেইসালাত একজন মুসল্লির জীবনকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে এবং সালাতবিহীনজীবনের হাহাকার দূর করতে সালাতের বিকল্প আর কিছু নেই।ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হলো সালাত। রাসুল (সা.) বলেন যে সালাত প্রতিষ্ঠা করে, সেতার পুরো দীন (জীবনবিধানকে) প্রতিষ্ঠা করে; যে সালাত বিনষ্ট করে, সে পুরোদীনকেই বরবাদ করে দেয়। (বুখারি)। কোরআন ও হাদিসে সালাত পড়া নয়, প্রতিষ্ঠারনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাত হিসাব করেই সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে পড়া আবশ্যক।কেননা, কেয়ামতের দিন সবার আগে সালাতেরই হিসাব নেওয়া হবে। (বুখারি ওযুসলিম)। সালাত পবিত্রতার প্রতীক ও জান্নাতের চাবিকাঠি। (বুখারি ও তিরমিজি)।রাসুল (সা.) বলেন যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করে, সে জাহান্নামি। রাসুল (সা.) বলেন, ইমান ও72মুমিনের বেঁচে থাকার স্পন্দন নামাজ :নামাজ প্রতিক্ষণের সুস্থির অনুভব-উপলব্ধি, তিলাওয়াত-তাসবিহ, রুকু-সিজদার জন্যযে তৃষ্ত্া তৈরি করে, মৃত্যুর পরও তা বাকি থেকে যায়। সালাতের ব্যবহারিক ও বাহ্যিকদিকগুলো স্বল্পসময়ে আয়ত্তে আনা যেতে পারে, তবে অভ্যন্তরীণ উন্নতির ক্রমধারা যাউপলব্ধি ও সূক্ষ অনুভূতির জন্ম দেয়, তা আমৃত্যু শাণিত করতে হয়। তাই সালাতপ্রতিষ্ঠা এবং অব্যাহত শিক্ষার ও অনুশীলনের বিষয়টিও অন্তহীন।শাণিত ও শাশ্বত সালাত কেবল সালাতই নয়, তা মুমিনের বেচে থাকার হৃৎস্পন্দনওবটে। আত্মার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে এবং প্রকৃত আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলোআল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। সেই মহান অস্তিত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায়রাখা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিত সালাত আদায় করাএবং স্বীয় সালাতের পবিত্র প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করা। এভাবেইসালাত একজন মুসল্লির জীবনকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে এবং সালাতবিহীনজীবনের হাহাকার দূর করতে সালাতের বিকল্প আর কিছু নেই।ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হলো সালাত। রাসুল (সা.) বলেন যে সালাত প্রতিষ্ঠা করে, সেতার পুরো দীন

(জীবনবিধানকে) প্রতিষ্ঠা করে; যে সালাত বিনষ্ট করে, সে পুরোদীনকেই বরবাদ করে দেয়। (বুখারি)। কোরআন ও হাদিসে সালাত পড়া নয়, প্রতিষ্ঠারনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাত হিসাব করেই সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে পড়া আবশ্যক।কেননা, কেয়ামতের দিন সবার আগে সালাতেরই হিসাব নেওয়া হবে। (বুখারি ওমুসলিম)। সালাত পবিত্রতার প্রতীক ও জান্নাতের চাবিকাঠি। (বুখারি ও তিরমিজি)।রাসুল (সা.) বলেন যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ত্যাগ করে, সে জাহান্নামি। রাসুল (সা.) বলেন, ইমান ওকুফরের মধ্যবর্তী দেয়াল হলো সালাত। সালাত মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে বা নিয়ন্ত্রিতজীবনযাপন শিক্ষা দেয়। মানুষ যা দেখে তা শেখে, তা ভাবে। তাই দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণমননিয়ন্ত্রণের জন্য অপরিহার্য, এর দ্বারা কর্মও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ জন্যই সালাতে দৃষ্টিনিয়ন্ত্রণ অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়।তাকবিরে তাহরিমার সময় দৃষ্টি সিজদার জায়গায়। দাঁড়ানো অবস্থায়ও দৃষ্টি সিজদারজায়গায়। রুকু অবস্থায় দৃষ্টি পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে । পুনরায় দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টিসিজদার জায়গায়। সিজদা অবস্থায় দৃষ্টি নাকের আগায়। বসা অবস্থায় দৃষ্টি নাভিতে।সালাম দেওয়ার সময় দৃষ্টি কাঁধে নিবদ্ধ থাকবে। এভাবে সালাত আদায় করলেমনোনিয়ন্ত্রণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে, সালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সফল হবে।

জামাআতে নামাজ পড়ার গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করে দিয়েছেন।আবার এ নির্ধারিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে ইমামের সঙ্গে জামাআতে আদায়করার ব্যাপারে তিনি সুনানে হুদা নির্ধারণ করেছেন। বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জামাআতে নামাজ আদায়ে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। মসজিদে ইমামেরসঙ্গে জামাআতে নামাজ আদায়ের মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ হিকমত এবংবিশ্বনবির গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের বাস্তবায়ন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামদুনিয়ার জীবনে কখনো জামাআত ব্যতীত নামাজ আদায় করেননি। আজান শোনারপর ওজর ব্যতীত জামাআতে উপস্থিত না হওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ ।যারা আজানশোনার পর জামাআতের সঙ্গে নামাজ আদায় করে না তারা দুনিয়ার কল্যাণ ও হিকমতএবং বিশ্বনবির গুরুত্বপূর্ণ সুনাত পালন থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাআতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপকরেছেন হজরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আজান শোনার পর নামাজের জামাআতে(মসজিদে) উপস্থিত হয় না এবং জামাআতে উপস্থিত না হওয়ার কোনো ওজর বাকারণও না থাকে; এমতাবস্থায় যদি সে একাকি নামাজ আদায় করে, তবে ওই ব্যক্তির(একাকি) নামাজ কবুল হবে না।একজন সাহাবা জানতে চাইলেন, ওজর বা কারণবলতে কি বোঝায়? উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ভয় অথবাঅসুস্থতা ।

(আবু দাউদ) নামাজ আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে সময় নির্ধারণকরে দিয়েছেন। সে সময় অনুযায়ী জামাআতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারেও সঠিক পন্থানির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে অন্য হাদিসে এসেছে-হজরত আবদুল্লাহ ইবনেমাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনাকরছেন। তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য সুনানে হুদা বাহিদায়াতের পন্থা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সাথেমসজিদে আদায় করাই হচ্ছে সুনানে হুদা।তোমরা যদি তোমাদের ঘরে নামাজ আদায়করা শুরু কর, যেমন অমুক ব্যক্তি জামাআত ছেড়ে ঘরে নামাজ আদায় করে, তাহলেতোমরা তোমাদের নবির সুন্নাত ছেড়ে দিলে। যদি তোমরা নবির সুনাত ছেড়ে দাও,তাহলে হিদায়াতের পথ থেকে তোমরা বিচ্যুত হয়ে পড়বে। (মুসলিম,মিশকাত)পরিশেষে...নামাজের জামাআতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বনবির ছোট্ট একটিহাদিস দিয়ে শেষ করতে চাই। বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"নামাজের আজান হওয়ার পরও যারা ঘর থেকে মসজিদে নামাজের জামাআতে উপস্থিতহয় না। যদি সেসব ঘরে নারী এবং শিশু না থাকতো, তবে তিনি সে সব ঘরে আগুনধরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতাম।

ফজরের নামাজের উপকিরিতা:

ফজরের বিশেষ গুরুত্ব যেমন নামাজের মধ্যে আছে, তেমনি সময়ের মধ্যেও । কোরআনেসুরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা বলেন, শপথ ফজরের । (সুরা ফজর, আয়াত: ১)

ফজরের নামাজ পড়ার কয়েকটি উপকারের কথা জানা যাক:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেনঅর্ধেক রাত পর্যন্ত নফল নামাজ আদায় করল। আর যে ফজরের নামাজ জামাতেরসঙ্গে আদায় করল, সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।" (মুসলিম, হাদিস:১৩৭৭)

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও তার সবকিছুর চেয়েউত্তম।" (মুসলিম, হাদিস: ১৫৭৩)

৩. রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, "যে ফজরের নামাজ আদায় করল, সে মহান আল্লাহররক্ষণাবেক্ষণের অন্তভূক্তি হলো।" (মুসলিম, হাদিস: ১৩৭৯)

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, "সেই মানুষটি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়েরআগের এবং সূর্যাস্তের আগের অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামাজ আদায় করে।' (মুসলিম,হাদিস: ১৩২২)

৫. রাসুল (সা.) বলেন, "মুনাফিকদের জন্য ফজর ও এশার চেয়ে বেশি ভারী কোনোনামাজ নেই। এ দুই নামাজের ফজিলত যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়েহলেও তারা উপস্থিত হতো।" (বুখারি, হাদিস: ৬৫৭)

৬. খলিফা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর বরাতে একটি হাদিস জানা যায়।রাসুলুল্লাহ (সা.) নাজদের দিকে এক অভিযানে একটি সেনাদল পাঠান। তারা প্রচুরগণিমতের সম্পদ অর্জন করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তাদের সঙ্গে যায়নি এমনএকজন বলেন,'অল্প সময়ের মধ্যে এত পরিমাণে ভালো গণিমত নিয়ে এদের চেয়েতাড়াতাড়ি আর কোনো সেনাদলকে আমরা ফিরে আসতে দেখিনি ।''তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দলের কথা বলবনা, যারা এদের চেয়ে তাড়াতাড়ি উত্তম গণিমত নিয়ে ফিরে আসে? যারা ফজরেরনামাজে জামাতে হাজির হয়, (নামাজ শেষে) সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহ তাআলারজিকির করতে থাকে, তারাই অল্প সময়ের মধ্যে উত্তম গণিমতসহ প্রত্যাবর্তনকারী ।''(সুনানে তিরমিজি: ৩৬৪১)

নামাজে বান্দার প্রশান্তি:

নামাজে কী বান্দার প্রশান্তি মেলে?

নামাজে যুক্তি। নামাজে প্রশান্তি। নামাজে মেরাজ। নামাজে বান্দার সাথে প্রভুরকথোপকথন। নামাজই সব। হাশরের মাঠের চালান পুঁজি হলো নামাজ । এ দিন বান্দারনামাজের হিসাব আগে নেয়া হবে। পার্থিব জীবনে যারা নামাজের প্রতি যত্নবান হবেতারাই উভয় জাহানে সফলকাম। পার্থিব বিপদ-আপদ বালা-মুসিবত দূরীকরণেনামাজের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাকে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে,তোমরা নামাজের মাধ্যমে আমার সাহায্য কামনা করো। কুরআনে ইরশাদ, হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।' (সূরা আল-বাকারা:১৫৩)।নামাজ বান্দার আমলনামা থেকে গোনাহ গুলো ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে নিষ্পাপবানিয়ে দেয়। হযরত আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা?)ইরশাদ করেছেন, "তোমরা বলতো, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনে একটি নহরথাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতেপারে? সাহাবাগণ উত্তরে বললেনঃ না, কোনো ময়লাই অবশিষ্ট থাকবে না। অত:পররাসূল (সা:) বললেন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত এমনই। এর বিনিময়ে আল্লাহ পাকনামাজীর সকল গোনাহ মাফ করে দেন।" (বোখারি:৫০৩)।নামাজ আদায় করতে হলে দেহ-মন পবিত্র রাখতে হয়। অন্তরের পবিত্রতার সাথেসাথে বাহ্যিক পবিত্রতা বজায় রাখতে হয়। নামাজ এমনই এক আমল যা পবিত্রতাছাড়া আদায় করা যায় না। যারা যথাযথ নিয়মে খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করবেআল্লাহতায়ালা তাদের নিকট থেকে জাহান্নামের আগুন দূরে রাখবেন। কুরআনে ইরশাদহয়েছে, 'নিশ্চয়ই এ সকল ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাজে খুশ্ু-খুযুর সাথে আদায় করে ।' (সূরা মুমিনূন:১-২)।হযরত হানজালা উসাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদকরেছেন, "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ পাবন্দির সাথে আদায় করে, উত্তমরূপেঅজু করে, সময়ের প্রতি খেয়াল

রাখে, রুকু-সিজদা ঠিকমতো আদায় করে এবং এভাবেনামায আদায়কে নিজের উপর আল্লাহ তা'আলার হক মনে করে তবে জাহান্নামেরআগুন তার জন্য হারাম করে দেয়া হবে।' (মুসনাদে আহমাদ-৪: ২৬৭পৃ)।হযরত নাওফেল ইবনে মুয়াবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদকরেছেন, 'ঘার এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেল তার যেন ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ওধন দৌলত সবকিছু ছিনিয়ে নেয়া হলো।" (ইবনে হিব্বান-৪:৩৩০ পৃ.)।হাশরে মাঠে নামাজের হিসাবের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আমলের হিসাব নেয়া হবে।যারা নামাজের হিসাব সঠিকভাবে দিতে পারবে । তাদের জন্য অন্যান্য আমলের হিসাবসহজ করে দেয়া হবে। নামাজী বান্দা হাশরের মাঠে আনন্দ উল্লাস করতে থাকবে। এদিন তাদের কোনো ভয় থাকবে না। দুনিয়াতে যারা নামাজ সম্পর্কে গাফেল ছিলো,সেদিন তারা হা-হুতাশ করতে থাকবে।হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল (সা:) ইরশাদকরেছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাজের হিসাব নেয়া হবে। যদি নামাজঠিক থাকে তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। আর যদি নামাজেরহিসাবে গড়মিল হয়, অন্যান্য আমলও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে।' (তিরমিযি-১:২৪৫পৃ.)।কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও । আর তোমরানিজেদের জন্য অগ্রে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।' (সূরাবাকারা:১১০)।"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহযে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তারা এমন ব্যবসারআশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না।' (সূরা ফাতির:২৯)।নামাজ আদায়কারী বান্দার অন্তর সব সময় প্রশান্ত থাকে। তাদের দেহ-মনে কোনোকালিমা থাকে না। তারা সর্বোচ্চ নেয়ামত জান্নাতের উত্তরাধীকারী হবেন। তাদেরকেপরোকালে জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা দেয়া হবে । কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যারা নিজেদেরসালাতের হিফাজত করে, এরাই আল্লাহর জানাতে মর্যাদা সহকারে প্রবেশ করবে ।(সুরা মা'আরিজ :৩৪-৩৫)।"যারা তাদের সালাত সমূহের হিফাজতকারী, মূলত: এরাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউসেরউত্তরাধিকারী এবং সেখানে তারা স্থায়ী ভাবে থাকবে । (সূরা মুমিনুন: ৯-১১)

বিভিন্ন প্রকার সালাত:

১.সালাতুল বিতর:

বিতর" আরবি শব্দ। এর অর্থ বেজোড়। এ সালাত তিন রাকআত বিধায় এটিকে বিতরবলা হয়। এশার সালাতের পর তিন রাকাআত বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব ।বিতর সালাত পড়ার নিয়ম:অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় দুই রাকআত সালাত পড়ে তাশাহহুদ পড়তে হয়। এরপরতৃতীয় রাকআতেরে জন্য দাড়িয়ে সুরা ফাতিহার পর কোনো সুরা বা আয়াত পড়তেহয়। কিরাআত শেষ করার পর "আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হয়।তারপর হাত বেঁধে চুপে চুপে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। দোয়া কুনুত শেষে রুকুতেযেতে হয়। তারপর যথারীতি দুই সিজদার পর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়ামাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিতর সালাত সমাপ্ত করতে হয়।

২.জুমার সালাত:

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন। আর এই দিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলোজুমার সালাত। জুমা শব্দের শাব্দিক অর্থ একত্রিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া, সমবেতহওয়া ইত্যাদি। শুক্রবারে সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে যুহরের সালাতের পরিবর্তেজামাআত সহকারে যে সালাত আদায় করে তা হলো জুমার সালাত।

জুমার সালাতের গুরুত্ব:

জুমার সালাত আদায় করা ফরয । কেউ যদি এই সালাতকে অস্বীকার করে তাহলে সেকাফির বলে পরিগণিত হবে । বিনা ওযরে কেউ যদি পর তিন জুমআহ বাদ দেয় তাহলেসে আল্লাহর কাছে মুনাফিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এই সালাতের অনেক ফযিলতরয়েছে। সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরাআল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়,যদি তোমরা উপলব্ধি করো ।'(সুরা জুমু'আ, আয়াত-৯)জুমার দিনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, "সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমারদিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলএবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই দিনেই তাঁকে জান্নাতথেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে ।' (বুখারি) জুমার দিনে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি। হযরত ফাতিমা (রা.) শুক্রবারদিনের শেষ ভাগে আসরের পর কাজকর্ম ছেড়ে আল্লাহর যিকর ও দোয়ায় শামিলহতেন। এদিনে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার অধিক সম্ভবনারয়েছে।

জুমার সালাত আদায়ের নিয়ম:

ইসলামে জুমার সালাত আদায়ের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন _ মহানবি(সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পর পর তিন জুমার সালাত পরিত্যাগ করে, তারঅন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করেদেওয়া হয় (তিরমিযি)।জুমার দিনে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল অযু ও দুইরাকাআত দুখুলুল মসজিদ নফল সালাত আদায় করে চার রাকাআত কাবলাল জুমাসুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে হয়। এর পর ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সময়উপযোগী খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন। মুসল্লিদের জন্য এই খুতবা শোনা ওয়াজিব।এই সময় কথা বলা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের পিছনে দুই রাকাআত ফরয সালাতআদায় করতে হয়। কোনো কারণে জুমার সালাতে শরিক হতে না পারলে যুহরেরসালাত আদায় করতে হয় ।

জুমার দিনের আদব:

১. জুমার দিনে ইবাদাতের নিয়তে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা ।
২. মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা ।

৩. নখ কাটা।

৪. সুরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।

৫. জুমা দিবসে বেশি করে দরূদ পড়া।

৩.সালাতুল জানাযা

জানাযা শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো খাট বা খাটিয়া, খাটিয়ার উপর দাফনকাফনের জন্য রক্ষিত লাশ। আর সালাতুল জানাযা হলো এক বিশেষ সালাত যা মৃতমুসলমানকে কবর দেওয়ার আগে অনুষ্ঠিত হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে জানাযার সালাতহলো “ফরযে কেফায়া। সমাজের কিছুসংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকেআদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। এই সালাতেরমধ্যে রুকু ও সেজদা করার বিধান নেই। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জানাযার সালাত বসেআদায় করার সুযোগ নেই।জানাযা সালাতের ফরয ২টি

১. চার তাকবির বলা

২. দাড়িয়ে সালাত আদায় করা।

জানাযা সালাতের ওয়াজিব ১টি

১. তাকবিরের পর ডানে ও বামে দুবার সালাম বলে সালাত শেষ করা।

জানাযা সালাতে সুন্নত ৩টি
১. হামদ ও সানা পড়া ।
২. দরুদ শরিফ পড়া।

৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

জানাযা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

জানাযা সালাত মূলত মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের পক্ষ থেকে বিশেষ দোয়া ইসলামিশরিয়তে জানাযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। জানাযা সালাতে মৃত-জীবিত, উপস্থিত,অনুপস্থিত নারী-পুরুষ সবাইকে দোয়ার মধ্যে শামিল করা হয়। এ প্রসঙ্গে মহানৰি(সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তারজন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে ।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) জানাযা সালাতে শুধুমৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় না বরং জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলে উপকৃত হয়। রাসুলুল্লাহ(সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে তার জন্য এক কিরাত (অসীমসওয়াব) আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য সম্পাদন হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে তার জন্যদুই কিরাত (অসীম সওয়াব) রয়েছে।' (তিরমিযি) উল্লেখ্য, একেকটি কিরাত হলো উহুদপাহাড় পরিমাণ। সুতরাং আমরা জানাযা সালাত আদায় করে অসীম সওয়াব লাভেরচেষ্টা করব।

সালাতুল জানাযা আদায়ের নিয়ম:

মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে মুখ রেখে ইমাম বুক বরাবর দাঁড়াবে । তারপর মনে মনেনিয়ত করতে হবে। প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে।অতঃপর সানা পড়বে । তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন "ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা' এর পরওয়া জাল্লা সানা উকা' বাক্যটি পড়া হয়। সানা শেষ হলে হাত বাঁধা অবস্থায় দ্বিতীয়তাকবির বলে দরুদ শরিফ পড়বে।এরপর আবার তৃতীয় তাকবির বলে নিম্নের দোয়াটি পড়বে।উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মায়্িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়াছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া

যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহুমিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহুআলাল ইমান।অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ওঅনুপস্থিত, আমাদের মধ্যে ছোট ও বড়, আমাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ সকলকে ক্ষমাকরুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন তাদেরকেইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনি যাদেরকে মৃত্যু দেবেন, তাদেরকে ইমানেরওপর মৃত্যু দান করুন।

৪.ঈদের নামাজ:

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, খুশি, উৎসব ইত্যাদি । ঈদের দিন হলো মুসলমানদেরজন্য এক আনন্দ ও উৎসবের দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, প্রত্যেকজাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)বছরে দুটি ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ একত্রেঈদগাহে সমবেত হন এবং দুই রাকআত ঈদের সালাত আদায় করে। ঈদের দিনবিশ্বের সকল মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়েছোট-বড়, আমির-ফকির একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ইবাদাত পালন করেথাকেন।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম:

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়।প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে । সানা পড়বে।তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরেকান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্যসালাতের মতো হাত বাঁধবে । ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকআত শেষ করেদ্বিতীয় রাকআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাওতার সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন, হাতবাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষকরবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লি খুতবা শোনাওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরেরঅনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধুনিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

ঈদের সালাতের সামাজিক প্রভাব:

ঈদ মানে মহা আনন্দের আয়োজন। ঈদ আমাদের সমাজ সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে

একাকার হয়ে গেছে। ঈদ ধর্মীয় উৎসব হলেও এটি এখন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঈদের দিন পরিবারের যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবাই একত্র হয়ে থাকে। সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার এটাই সর্বোত্তম সুযোগ হয়ে থাকে । ঈদের দিন মুসলমানরা একে অপরের খোঁজখবর নেয় ও একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে থাকে । ধনী-গরিব সবাই সকল প্রকার দুঃখ ভুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করে। সকল ভেদাভেদকে ভুলে সবাই একত্র হয়। ঈদের দিন পুরুষরা দলে দলে ঈদগাহে যায়। ছোট ছোট শিশুরা বাবা, ভাই ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে নতুন জামাকাপড় পড়ে ঈদগাহে যায়। সবার মধ্যে এক আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। জামাআতবদ্ধ হয়ে সবাই নামাজ আদায় করে । নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। ঈদগাহে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার সকলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ পায় সবাই। এর মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। গরিব ও অসহায়েরা বিভিন্ন সমস্যার কথা উপস্থিত মুসল্লিদের বলার সুযোগ পায় ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। ঈদের দিন সবাই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে যায়। কুশল বিনিময় করে থাকে । এর মধ্যে দিয়ে আত্মীয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়। ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় একে অপরে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে । যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত হয়।

৫.সালাতুত তারাবিহ:

তারাবিহ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা।‘‘তারাবিহ' শব্দটি আরবি তারভিহাতুন থেকে এসেছে, যার অর্থ বিশ্রাম করা, প্রশান্তিলাভ করা।তারাবি নামাজে যেহেতু প্রতি চার রাকাত পর পর একটু বিশ্রাম নিয়ে তাসবিহ ও দোয়াপাঠ করা হয়, তাই এই নামাজকে সালাতুত তারাবিহ বা তারাবি নামাজ বলা হয়।তারাবির নামাজ এশার ফরজ ও সুন্নত নামাজের পর এবং বিতিরের পূর্বে আদায় করাহয়। তারাবির নামাজ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। যেটা গুরুত্বের দিক থেকে ওয়াজিবেরকাছাকাছি।

তারাবিহ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত:

মাহে রমযানে তারাবিহ নামায আদায় করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.)বলেছেন: মহান আল্লাহ তাআলা মাহে রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং রাতেতারাবিহ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে পুণ্যের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন।পবিত্র রমযান মাস রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ারশ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারা দিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্তশরীরে তারাবিহের বিশ রাকআত সালাত আদায়

করে তখন আল্লাহ সে বান্দার প্রতিখুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একমাসেই আসে। তাই আল্লাহরপ্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন।তারাবির ফজিলত সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় কিয়ামুল লাইল তথা তারাবি আদায় করবে,তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।(বুখারি ও মুসলিম)তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সুরার মাধ্যমেও আদায় করা যায়। আবার কুরআনখতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়।ফজিলতপূর্ণ এ নামায রমযানের পুণ্যময় সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করাপ্রত্যেক ইমানদার মুসলমানের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর ।

৬.মাসবুকের সালাত:

যে মুক্তাদি ইমামের সাথে সালাতের প্রথম রাকআত থেকে পায় নি, তাকে মাসবুক(পিছে পড়া) বলে। মাসবুক ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যেঅবস্থায় পাবে, সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রণ করবে। তারপর ইমামেরসাথে সে নামায পড়তে থাকবে এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ করে তাশাহহুদ পাঠেরজন্য শেষ বৈঠকে বসে যাবে এবং 'আব্দুহু ওয়া রাসুলু‌ু" পযর্ত পড়ে অপেক্ষা করবে।ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুক ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়ারাকআতগুলো যথারীতি আদায় করবে । অবশিষ্ট সালাতে তার নিজের ভুল হলে সাহুসিজদাহও করতে হবে।প্রথমে কিরাআতওয়ালা রাকআত অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা মিলানোরাকআত এবং পরে কিরাআতবিহীন শুধু সুরা ফাতিহাওয়ালা রাকআত পড়বে । তারপরশেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবেরুকুসহ ইমামের সথে যে কয় রাকআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পরইমামের পেছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে এ রাকআত মাসবুককে আদায় করতেহবে।মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্যরয়েছে।যুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার পর যদি এক রাকআত ছুটে যায়, তবে ইমামেরসালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকআত সুরা ফাতিহারসঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে নেবে।দুই রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবংছুটে যাওয়া দুই রাকআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকআতফরয সালাত একাকী আদায় করা হয়।তিন রাকআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। একরাকআত সুরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সুরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এবৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকি দুই রাকআতের প্রথমরাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করবে এবং পরের রাকআতেশুধু সূরা ফাতিহা পড়বে । এরপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাছুরা পড়েসালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।চার রাকআত ছুটে

গেলে অর্থাৎ মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালামফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সে একাকী চার রাকআত নামায পড়লেযেভাবে পড়ত, ঠিক সেভাবে চার রাকআত নামায আদায় করবে।চার, তিন, দুই রাকআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামেরসালাম ফেরানোর পর যুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকআতগুলোএমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকআতবিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

৭.অসুস্থ ব্যক্তির সালাত:

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয । নির্ধারিত ওযর ব্যতীত সালাত পরিত্যাগকরা যাবে না। রুগ্ণ ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্যইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাতআদায়কে অসুস্থ ব্যক্তির সালাত বলে।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম:

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক । রোগ যতকঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না।যথাসম্ভব ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে। নামাযের সমুদয় আরকান-আহকাম যথাযথভাবে আদায় করতে সামর্থ্য না হলে ইশারায় হলেও ওয়াক্তের মধ্যেইনামায আদায় করতে হবে।রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদাহর সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। অসুস্থ ব্যক্তিকেবসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতই দুর্বল হয় যে বসে থাকাসম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উচু করেরাখতে হবে এবং মাথার নিচের বালিশ বা এ-জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটুউচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখেকাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে ইশারায় সালাত আদায় করবে । যদিএভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব সেভাবে সালাত আদায়করতে হবে।অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তসালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্ণব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ/ ছয় ওয়াক্তের বেশি সময়অতিবাহিত হয়, তবে আর ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে না। এ নামায আদায় নাকরতে পারার জন্য মহান আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে।নামারত অবস্থায়

কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলেবসে পড়তে হবে, বসে না পারলে শুয়ে বা ইশারা করে বাকি নামায আদায় করতেহবে।

৮.মুসাফিরের সালাত:

"মুসাফির" আরবি শব্দ। এর অর্থ সফরকারী । কোনো ব্যক্তি তার অবস্থানস্থল থেকে ৪৮মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরে সফর করার নিয়তে বের হয়ে নিজ শহর বা গ্রামপেরিয়ে গেলেই তিনি মুসাফির হয়ে যান। আর এ অবস্থায় গন্তব্যস্থলে কমপক্ষে ১৫দিন অবস্থান করার নিয়ত না করা পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। মানুষের জীবনেসফর কিংবা ভ্রমণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ যখন নিজের আবাসস্থলে থাকে, তখনপূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু ভ্রমণে বা সফরে মুসাফির অবস্থায় যোহর,আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর করতে হয়। "কসর'-এর অর্থ হলো কম করা বাসংক্ষেপ করা। কসর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক ধরনের সুবিধা। শরিয়াতনির্ধারিত দূরত্বে সফর করা কালে সালাত সংক্ষেপ করা ইসলামের বিধান। পবিত্রকুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা যখন জমিনে সফর করবে, তখন তোমাদের জন্যসালাতের কসর করায় কোনো দোষ নেই ।' (সুরা নিসা, আয়াত: ১০১)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি:

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআত বিশিষ্ট যোহর, আসর ও এশার ফরয সালাত দুইরাকাআত পড়বেন। কসর শুধু চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতেই হয়ে থাকে।অতএব, মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বিতরের সালাতে কোনো কসর নেই। আরএইভাবে সংক্ষেপে সালাত আদায়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ রেখেছেন।মুসাফির চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাত একাকী পড়লে বা মুসাফির ইমামেরপেছনে আদায় করলে, কসর করবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ নামাজ পড়া ঠিক নয়। আবদুল্লাহইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবির মুখে সালাতকে মুকিমঅবস্থায় চার রাকাআত ও সফর অবস্থায় দুই রাকাআত ফরয করেছেন।' (মুসলিম)মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় ইচ্ছাকৃত চার রাকাআত সালাত পূর্ণ করবে না। কিন্তুমুকিম ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায়করবে । আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "মুসাফির যদি মুকিমদের সঙ্গে সালাতেশরিক হয়, তবে সে যেন তাদের মতো চার রাকাআত সালাত পড়ে।' (ইবনে আবিশাইবা) মুসাফির ইমামতি করলে মুক্তাদিদের আগেই বলে দেবে যে সে মুসাফির এবংদুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকিম মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকাআতসালাত আদায় করে নেবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সফর অবস্থায় সর্বদা সালাত কসরকরেছেন। মুসাফির ব্যক্তির জন্য চলন্ত অবস্থায় সুন্নত না পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবেস্বাভাবিক ও স্থির অবস্থায় সুন্নত সালাত আদায় করবে।

মৃত্যুর সময় রাসূল ﷺ যে কথাটি বারবরা বলছিলেন:

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের শেষ মূহুর্ত চলছে। 'ঠিক সে সময় একজন লোকএসে ''সালাম' জানিয়ে বললেন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি। রাসূল (সাঃ) এরকন্যা ফাতিমা (রাঃ) বললেন, দুঃখিত আমার পিতা খুবই অসুস্থ । একথা বলে ফাতিমা(রাঃ) দরজা বন্ধ করে রাসূল (সাঃ) কাছে গেলেন। হযরত রাসূল (সা) বললেন, কেসেই লোক? ফাতিমা বললেন, এই প্রথম আমি তাকে দেখেছি। আমি তাকে চিনি না।রাসুল (সাঃ) বললেন শুনো ফাতিমা, সে হচ্ছে আমাদের এই ছোট্ট জীবনের অবসানকারীফেরেশতা আজরাইল। এটা শুনে হযরত ফাতিমার অবস্থা তখন ক্রন্দনরত বোবারমতো হয়ে গিয়েছে। রাসূল (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল আমার উম্মতের কি হবে?আমার উম্মতের নাজাতের কি হবে ? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, হে রাসুল আপনিচিন্তা করবেন না, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আপনার উম্মতের নাজাতের জন্যে।মৃত্যুর ফেরেশতা ধীরে ধীরে রাসূলের কাছে এলেন জান কবজ করার জন্যে। মালাকুলমউত আজরাইল আরো কাছে এসে ধীরে ধীরে রাসূলের জান কবজ করতে থাকলেন।পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জিব্রাইলকে রাসূল বললেন ঘোঙানির সাথে, ওহ জিবরাঈল এটাকেমন বেদনাদায়ক জান কবজ করা। ফাতিমা (রাঃ) তার চোখ বন্ধ করে ফেললেন,আলী (রাঃ) তার দিকে উপুড় হয়ে বসলেন, জিবরাঈল তার মুখটা উল্টা দিকে ফিরিয়েনিলেন।রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে জিবরাঈল তুমি মুখটা উল্টা দিকে ঘুরালে কেন, আমারপ্রতি তুমি বিরক্ত? জিবরাঈল বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাকারাতুল মউতের অবস্থায়আমি আপনাকে কিভাবে দেখে সহ্য করতে পারি!ভয়াবহ ব্যাথায় রাসূল ছোট্ট একটা গোঙানি দিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহসাকারাতুল মউতটা (জান কবজের সময়) যতই ভয়াবহ হোক, সমস্যা নেই, আমাকেসকল ব্যথা দাও আমি বরণ করবো, কিন্তু আমার উম্মাতকে ব্যথা দিওনা । রাসূলেরশরীরটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসতে লাগলো। তার পা, বুক কিছুই নড়ছে না এখনআর। রাসূলের চোখের পানির সাথে তার ঠোঁটটা কম্পিত ছিলো, তিনি কিছু বলবেনমনে হয়।হযরত আলী (রাঃ) তার কানটা রাসূলের মুখের কাছে নিয়ে গেলো। রাসূল বললেন,নামাজ কায়েম করো এবং তোমাদের মাঝে থাকা দূর্বলদের যত্ন নিও। রাসূলের ঘরেরবাইরে চলছে কান্নার আওয়াজ, সাহাবীরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরেকান্নারত। হযরত আলী (রাঃ) আবার তার কানটা রাসূলের মুখের কাছে ধরলো, রাসূলচোখ ভেজা অবস্থায় বলতে থাকলেন, ইয়া উম্মাতি, ইয়া উম্মাতি, ''হে আমার উম্মতেরানামাজ, নামাজ..! নামাজ..!!

নামাজ পরিত্যাগের বিধান

কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাতই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকনবাস্তস্ত এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা সালাতকে ঈমান নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর বাণী: "আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান (সালাত)-কে নষ্ট করে দিবেন।" [সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩]বিগত শরী'আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী'আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহতা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন "হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যেথেকেও ।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪০]এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,: "এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাতআদায় করতে।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩১]এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন "সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবেরসন্তোষভাজন।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৫]যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মারফত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়েযাওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি(পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকীরাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান। আল্লাহরই সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ।সালাত ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মানুষ এবং শির্ক কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য সালাত ছেড়ে দেওয়া"। (সহীহ যুসলিম)তিনি আরো বলেন, এশা"আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে পার্থক্য তা হলো সালাত। অতএব, যেসালাত ছেড়ে দিল সে কুফুরী করল।" (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)প্রখ্যাত তাবেঈ শাকীক ইবন আব্দুল্লাহ আল-উকাইলী বলেন, "সাহাবায়ে কিরাম সালাতব্যতীত অন্য কোনো আমল ছেড়ে দেওয়াকে কুফুরী মনে করতেন না।" (সুনানতিরমিযী)উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি সালাত ছেড়ে দিল ইসলামে তার কোনোঅংশ নেই।"উল্লিখিত ও অন্যান্য দলীলসমূহ সালাত পরিত্যাগকারী বড় কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ারসুস্পষ্ট প্রমাণ; যদিও সে পরিত্যাগকারী ব্যক্তি সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার না করে।আর এ মত পোষণ করেন ঈমাম আহমদ রহ. এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন: "সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দীনের যা হারাবে তাহলো আমানত এবং সর্বশেষ দীনেরযা হারাবে তাহলো সালাত"। (বাইহাকী হাদীসটিকে তার শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন)ইমাম আহমদ রহ. বলেন, "সুতরাং ইসলাম থেকে চলে যাওয়া সর্বশেষ বস্ত যখনসালাত তখন যে বস্তর শেষ চলে যায় সে বন্ত সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্যআপনাদের দীনের সর্বশেষ অংশ (সালাত)-কে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরুন, আল্লাহআপনাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" (ইমাম আহমদের কিতাবুস

সালাত)বর্তমান যুগে আমাদের বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারেকুফুরীর ফাতওয়া দিয়েছেন, আর তাদের শীর্ষে রয়েছেন, মাননীয় (সাবেক) মুফতীশাইখ আব্দুল আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায ও আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন উসাইমীনরহ.

নামাজ না পড়ার শাস্তি:

কুরআনে বর্ণিত নামাজ তরককারীর শাস্তির কথাগুলো মানুষ জানতে পারলে নামাজেরমতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে নিয়োজিত রাখবে । তাই কুরআনে ঘোষিত বেনামাজির শাস্তিরকথাগুলো তুলে ধরা হলো-আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নবী ও হেদায়েতপ্রাপ্তদের পর এলো এমন এক অপদার্থ বংশধর, যারা নামাজ বিনষ্টকরল এবং প্রবৃত্তির পূজারি হলো। সুতরাং তারা 'গাই' নামক জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষকরবে। তবে যারা এরপর তওবা করে নিয়েছে, ঈমান এনেছে এবং নেক আমলকরেছে তারাই তো জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোনো ধরনের জুলুমকরা হবে না।সুরা মারইয়াম : আয়াত ৫৯-৬০বেনামাজির অবস্থান হবে সাকার নামক জাহান্নাম। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটিকাজের হিসাব নেবেন। আর প্রতি কাজের হিসাব দিতে না পারলে শাস্তি অবধারিত।শাস্তি প্রাপ্ত মানুষকে তাদের অপরাধে কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা তাদেরঅপরাধগুলোও বলতে থাকবে । আল্লাহ তাআলা কুরআনে সে কথা তুলে ধরেন এভাবে- "কোন জিনিস (কাজ) তোমাদেরকে (সাকার) জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে আমরানামাজিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না।সুরা আল-মুদ্দাচ্ছির : আয়াত ৪২-৪৩আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে সময় মতো নামাজ আদায় করতেও বলেছেন। "নিশ্চয়ইনামাজ মুমিনদের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথেই ফরজ করা হয়েছে" । (সুরা : আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)যারা নামাজের বিষয়ে উদাসীন তাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, দুর্ভোগওই সমস্ত নামাজিদের জন্য, যারা নিজেদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন। (সুরা : আল-মাউন, আয়াত: ৪-৫)নামাজ না পড়লে শুধু পরকালেই নয়, দুনিয়ার জীবনেও নেমে আসে অশান্তি, হতাশা,অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট। দুনিয়ার জীবনে বেনামাজির জন্য ৫টি শাস্তির কথা জানাযায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে।১. আল্লাহতায়ালা নামাজ ত্যাগকারীকে দুনিয়ার জীবনে সব কাজের বরকত থেকেমাহরূম/বঞ্চিত করেন। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.বলেছেন, যে ব্যক্তির আসরের সালাত কাজা হয় তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদসবই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। (মুসলিম, হাদিস : ১৩০৪)রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য হাদিসে বলেন, 'নামাজ হলো ঈমানদার ওকাফেরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। আবার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দিলতবে সে কুফরি করল'। (তিরমিজি : ২৬২০, আবু দাউদ: ৪৬৭৮)২. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির চেহারায় কোনো নূর বা উজ্জ্বলতা থাকে না।৩. যে ব্যক্তি নামাজ ত্যাগ করে, ওই ব্যক্তি দুনিয়ার অন্যান্য ভালো কাজের কোনোপুরস্কারও পাবে না।৪. নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তির জন্য কোনো লোক দোয়া করলে, তা কাজে আসবে না।৫.

নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহতায়ালা সবসৃষ্টিজীবের কাছে ঘৃণিত। কোনো সৃষ্টিজীবই তাকে পছন্দ করবে না।৬. ইসলামের শান্তি ও প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হবে। (শারহুল আকিদাতুত তাহাবি :২৬৮)

বে নামাজির পরিনতি::

১. আল কুরআনে বলা হয়েছে,

"অতঃপর এমন এক সময় আসল যখন লোকেরা নামায ছেড়ে দিল, আর লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে গেল ।ফলে তারা শীঘ্রই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে যাবে। তবে কিছুলোক এ থেকে রেহাই পাবে, যারা তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমলকরবে ।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ৫৯-৬০)।

২. আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে,"(পেরকালে জান্নাতবাসীরা ঠাট্টার ভাষায় দোযখবাসীদের জিজ্ঞেস করবে) কী অপরাধতোমাদেরকে আজ আগুনে ঢুকিয়েছে? উত্তরে তারা বলবে-আমরা নামায পড়তাম না,আর মিসকীনকে খাবার দিতাম না।" (সূরা ৭৪, মুদ্দাসছির ৪২-৪৪)

৩. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,"তারা ঈমান আনেনি, নামাযও পড়েনি । বরং উল্টো তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেএবং (ঈমান থেকে) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ।অহংকারের সাথে বাড়ি ফিরেগিয়েছে, পরিবারপরিজনের কাছে ।(অতএব, হে বেঈমান, হে বে-নামাযী!) তোমার জন্যদুর্ভোগ আর দুর্ভোগ!আবারও বলছি, তোমার জন্য দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ! মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে,কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়া) এমনিই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে?" (সুরা ৭৫;কিয়ামাহ ৩১-৩৬)

৪. আল্লাহ তাআলা বলেন,"(কিয়ামতের) দিন হাঁটুর নিম্নাংশ উন্মুক্ত করা হবে, আর (বেনামাধীদেরকে ডাকা হবেতাদের রবকে সিজদা করার জন্য । কিন্তু সেদিন তারা তা (শত চেষ্টা করলেও) পারবেনা। তাদের দৃষ্টি থাকবে ভীত বিহ্বল এবং অবস্থা হবে অত্যন্ত অপমানজনক । (দুনিয়ারজীবনে যখন) তাদেরকে (নামাযের) সিজদার জন্য ডাকা হতো (তখন তা তারাকরেনি)। অথচ তারা তখন ছিল সুস্থ (ও সক্ষম)। (সূরা ৬৮; কলম ৪২-৪৩) উল্লেখ্যযে, এ বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তা হলো, আবু সাঈদখুদরী (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেন, আমাদের রব তাঁর পায়ের গোছা উন্মুক্তকরবেন। তখন প্রত্যেক মুমিন নর-নারী তাকে সিজদা করবে ।(কিন্তু বেনামাধীরা সেদিনতা পারবে না।)

৫. আল্লাহ তাআলা বলেন,"যখন তাদের বলা হতো রুকু কর (অর্থাৎ নামায পড়) তখন তারা রুকু করত না(অর্থাৎ নামায পড়তো না) সত্যকে যারা মিথ্যা বলতো এসব লোকদের জন্য ধ্বংস।"(সুরা ৭৭; মুরসালাত ৪৮)। যারা এ যিকির (সালাত আদায় করবে না তাদের জীবনহবে সংকুচিত (কঠিন) এবং কিয়ামতের দিন হাশরে উঠবে তারা অন্ধ অবস্থায় ।"হ্যো) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জন্যে (জীবনে) বাঁচার সামগ্রীসংকুচিত হয়ে যাবে,

(সর্বোপরি) তাকে আমি কিয়ামতের দিন অন্ধ বানিয়ে হাজিরকরবো।" (সুরা ২০; ত্বা-হা ১২৪)হাশরের ময়দানে যেসব বেনামাজি অপমানিত হবে ।দুনিয়াতে যারা যথাযথভাবে নামাজআদায় করবে, পরকালে তারা আল্লাহর নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে ।আর যারা দুনিয়াতে যথাযথভাবে নামাজ পড়বে না, লোক দেখানো কিংবা সুনাম লাভেরআশায় নামাজ পড়তো তারা সে দিন সেজদা করতে পারবে না। বরং তারা হবেঅপমানিত ও লাঞ্ছিত। আল্লাহ তাআলা বলেন- সেই চরম সংকটময় কিয়ামত দিবসের কথা যেই দিন তাদেরকে আহবানকরা হবে সেজদা করার জন্য কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা। তাদের দৃষ্টি অবনতহবে, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল, তখন তো তাদেরসেজদা করার আহ্বান করা হতো (কিন্তু তারা সেজদা করেনি)।__সুরা আল-কালাম : আয়াত ৪২-৪৩

বে-নামাযীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হুশিয়ারী:

তাদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

৬. রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "একজন মুসলমান ও শির্ক-কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলোনামায পরিত্যাগ করা। (অর্থাৎ নামায যে কেউ ছেড়ে দেয়, সে লোক আর কাফেরমুশরিকের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না) (মুসলিম)

৭. অপর এক হাদীসে তিনি আরো বলেছেন, "আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলোনামায নিয়ে। যে ব্যক্তি এ নামায ছেড়ে দিল সে কুফরী করল (বা কাফের হয়ে গেল)।"(আহমাদ ও আবু দাউদ)

৮. "যে ব্যক্তি তার সালাত হেফাযত করবে, কিয়ামতের দিন তার জন্য থাকবে নূর,প্রমাণ ও নাজাত। আর যে ব্যক্তি তার সালাতের হেফাযত করবে না তার জন্য কোননূর নেই, নাজাত নেই, মুক্তির জন্য তার পক্ষে কোন দলীল থাকবে না এবং কিয়ামতেরদিন কারূন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফ (এসব কাফির মুশরিকদের) সাথেতার হাশর হবে ।" (মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

বে নামাজি সম্পর্কে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের উক্তি:

৯. দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করলইসলামে তার জন্য আর কোন কিছুই রইল না।"

১০. তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক বলেন, "নবী (স)-এর সাহাবাগণ একমাত্র নামাযতরক করা ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলে উল্লেখ করেননি ।"(তিরমিযী) অর্থাৎ নামাযই একমাত্র ইবাদত যা পরিত্যাগ করাকে তারা কুফরী বলেবর্ণনা করেছেন

উপসংহার:

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মে উপাসনার নিজস্ব পদ্ধতি থাকলেও নামাজের মতো এমন সামগ্রিকইবাদত আর নেই। নামাজির জন্য এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা আক্ষরিক অর্থেইসামগ্রিক এমন একটি ব্যায়াম, যার প্রভাব মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গের উপরে পড়ে এবংমানুষের প্রতিটি অঙ্গ নড়াচড়ার ফলে তার দেহে শক্তি সৃষ্টি হয় এবং সর্বোপরি এরদ্বারা তার সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে।ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলূসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মতঅনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কিরাত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ওরুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে নামাজ। এ কারণে নামাজ যেন মুসল্লিকেবলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না । তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করোনা, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্যহবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছ, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্্কে প্রকাশ করে। এরপরওযদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে । আর স্ববিরোধীকাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে। -রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২শুধু তাই নয়, নামাজ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক পবিত্রতা সাধনের অনন্যহাতিয়ার।